আমরা ও ফেলুদা

e-নববর্ষ সংখ্যা
১৪২১

বৈশাখী জমজমাট

আমরা ও ফেলুদা

e-magazine

"~FELUDA FAN CLUB~"

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

রহস্যের সমাধানে ঘুরে বেড়াও তুমি,

অর্থ নয়; সত্যটাই তোমার কাছে দামী.

শহরে-বনে ঘুরে বেড়াও তদন্তের খাতিরে,

পেছপা হবে না তুমি সমাধান না করে.

কাজ নয় চাপ নয় শখের গোয়েন্দা,

আমাদের প্রিয় তুমি প্রিয় ফেলুদা

- মোঃ আঃ মুকতাদির

বৈশাখী জমজমাট

পয়লা বৈশাখ, 15 এপ্রিল 2014

সূ.চি.প.ত্র

গ ল্পে র ঝু লি

ছ ড়া - ক বি তা

বি শে ষ র চ না

প্র ব ন্ধ

রঙ পেন্সিলের আঁচড়ে

আ লো র চি ত্র রে খা

ধাঁধাঁ

লিমেরিক

মোঃ আঃ মুকতাদির

প্রচ্ছদ

রৌনক ব্রাউন

সম্পাদক মণ্ডলী

উজ্জ্বল দত্ত, অঙ্গনা সেনগুপ্ত, সহেলী রায়, সোমা মজুমদার, চিরঞ্জিত দাস, সৌমী মল্লিক, রৌনক ব্রাউন, দেবায়ন ঘোষ, শুক্লা সিংহ, শুভদীপ ভট্টাচার্য, সায়নদীপ চট্টপাধ্যায়, আখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রক্তিম আচার্য

প্রকাশক

"~FELUDA FAN CLUB~" কতৃক Facebook থেকে digital PDF format –এ প্রকাশিত এবং সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই Magazine – এ ব্যবহৃত বিভিন্ন স্কেচ, ড্রইং ইত্যাদি Google থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলির Owner & Original Uploader – দের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

“ফেলুদা ফ্যান ক্লাব”

“~FELUDA FAN CLUB~”

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

Email: feludafanclub.01@gmail.com

সম্পাদকদের মুখ থেকে

'নতুন বছর' এই কথাটা শুনলেই মনটা আনন্দে নেচে ওঠে, তা সে বাংলা হোক বা ইংরেজি। যদিও আমরা বসন্তকে বিদায় জানিয়ে গ্রীষ্মকে আলিঙ্গন করতে চাইনা, তবুও আমরা ১লা বৈশাখকে সাদরে আহ্বান জানাই, যতই সে গ্রীষ্মের দাবদাহকে সাথে করে আনুক না কেন। আমরা যারা বাংলা ভাষাকে ভালবাসি, বাঙালী বলে গর্ব বোধ করি, তাদের কাছে এই বৈশাখের আর একটা গুরুত্ব আছে, সেটা হলো পঁচিশে বৈশাখ। তাই তো আমরা নববর্ষে গেয়ে উঠি 'এসো হে বৈশাখ'।

নতুন বছর বলতেই সবার প্রথমে আমাদের মনে আসে নতুন জামা, হালখাতার নতুন গয়না আর খাওয়া দাওয়া, অথবা নতুন কোনো প্রতিজ্ঞা। এত নতুনের মাঝে নতুন বই বা নতুন ম্যাগাজিন হবেনা তা কি হয়, যতই হোক আমরা বইপ্রেমী বাঙালী বলে কথা। তাই এই নববর্ষে আমাদের ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের নিবেদন ‘আমরা ও ফেলুদা’ নববর্ষ সংখ্যা।

বিনয়াবনত

আমরা ও ফেলুদাঃ e-magazine –এর

সম্পাদক-সম্পাদিকা বৃন্দ

“~FELUDA FAN CLUB~”

এভারগ্রীনদের লিমেরিক

নীলশ্রী চক্রবর্তী

গুণ তাদের কম নয় আছে ষোলো আনা

তাদের রসে বসে সারা জীবন

কাটাল সকল বাঙালি ছানা

তাদের সৃষ্ট এক একটি চরিত্র যেন

মনে হয় বাস্তব হলে যেন

হত না কোনো ক্ষতি

ভালই হত আমার বন্ধু হত যদি

হিজিবিজবিজ কিংবা হাসজারু

হুঁকোমুখো হ্যাংলা অথবা পাগলা দাশু

দাশুর সাথে কথা বলা জানি সে ভারী ঝকমারি

তাও সুযোগ হলে তাকে নিয়ে যাব শঙ্কুর ল্যাবরেটরি

শঙ্কুর স্বর্ণপর্নিতেও সারবে না কি তার পাগলামি ?

ফেলুদা থাকলে ২১ রজনী সেনে

আমি গিয়ে আসব জেনে

কেমন করে তারা তিনজনে

এগিয়ে চলে এত সাহস করে

ইচ্ছে করে শিখে নিতে কিছু কৌশল কেরামতি

যা দিয়ে আমিও করতে পারব ডাকু গন্ডারিয়ার গতি

তার আগে চেয়ে নেব শঙ্কুর অ্যানাইহিলীন পিস্তল

স্পটে বুদ্ধি পিছলে গেলে

শয়তানকে ঘায়েল করা হবে ভাত জল

হেসোরাম হুঁশিয়ারির সাথে আছি রাজি যেতে

অদ্ভুত জানোয়ারের খোঁজে

শেষমেষ আসতাম হয়ত ফিরে

চন্দ্রখায়ইয়ের মত গপ্পোথেরিয়াম হয়ে।

আর একজন আছেন গপ্পোথেরিয়াম

তারিণী বাঁড়ুজ্যে তার নাম

গপ্পের স্টক যার অফুরান

এদের কারো কথা শেষ হবার নয়

বলতে গেলে আরো বলি মনে হয়।

সত্যজিতের খাওয়াদাওয়া

- চিরঞ্জিত দাস

আমাদের বাঙালির গর্ব বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের খাওয়া-দাওয়ার কেমন অভ্যাস ছিল সেটা অনেকদিন ধরেই জানতে ইচ্ছা করছিল। সেটা জানতে পেরে গেলাম আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকে। কিছুদিন আগেই সে সন্দীপ রায়ও ললিতা রায়ের সঙ্গে তার কাজের ব্যাপারে দেখা করতে গেছিল।যাবার আগেরদিন আমি তাকে বলেছিলাম কাজ হয়ে গেলে এই কথাটা যেন সে জেনে আসে।সে জেনে ছিল এবং সেই কথাটাই আমি আপনাদের বলছি।

ওনার নাকি সবচেয়ে পছন্দের খাবার ছিল লুচি, অড়হর ডাল বা আলুরদম।মাঝেমাঝে ছোলার ডালও খেতেন। আমরা ছোলার ডাল দিয়ে লুচি খাওয়ার কথা সকলেই জানি অড়হর ডালটা প্রথম শুনলাম। এর রেসিপিটা হল খুব সাধারণ। ওই জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর একটু হিঙের ফোড়ন দিয়ে সাঁতলানো হত। এছাড়া উনি দই খেতে খুবই পছন্দ করতেন। রোজই খাবার পরে দই খেতেন। ছোট থেকেই মা সুপ্রভাদেবী ওনাকে কমলালেবুর রস খাবার একটা অভ্যাস করেছিলেন তাই রোজ উনি এটা খেতেন। খিচুড়ী খেতে উনি খুব ভালবাসতেন,সঙ্গে ইলিশ মাছ। মাছের মধ্যে ইলিশটাই ওনার জন্য বাড়িতে বেশি আসত। এছাড়া রুইমাছও খেতেন মাঝেমধ্যে। তবে অন্য মাছে ওনার আর ভক্তি তেমন ছিল না। পাঁঠার মাংস ওনার খুব প্রিয় ছিল তবে শেষের দিকে তার খাওয়াদাওয়ার ওপর নানান বিধিনিষেধ হওয়ার কারণে মাংসটা বন্ধ হয়ে যায়। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রায়বাড়িতে নলেনগুড় খুব আসত;সঙ্গে গুড়ের সন্দেশ ও মোয়া। বিলেতি খাবারও খেতে ভালোবাসতেন খুব,তাই মাঝেমাঝেই পরিবারসমেত পার্ক-স্ট্রিটের একটি রেস্তোরাঁ ‘স্কাইরাম’-এ গিয়ে ফিসফ্রাইও খেতেন প্রায়ই যদিও এখন রেস্তোরাটা আর নেই।

বৈশাখী

অর্কিডের মলিন ছায়ায়
-আখর বন্দোপাধ্যায়
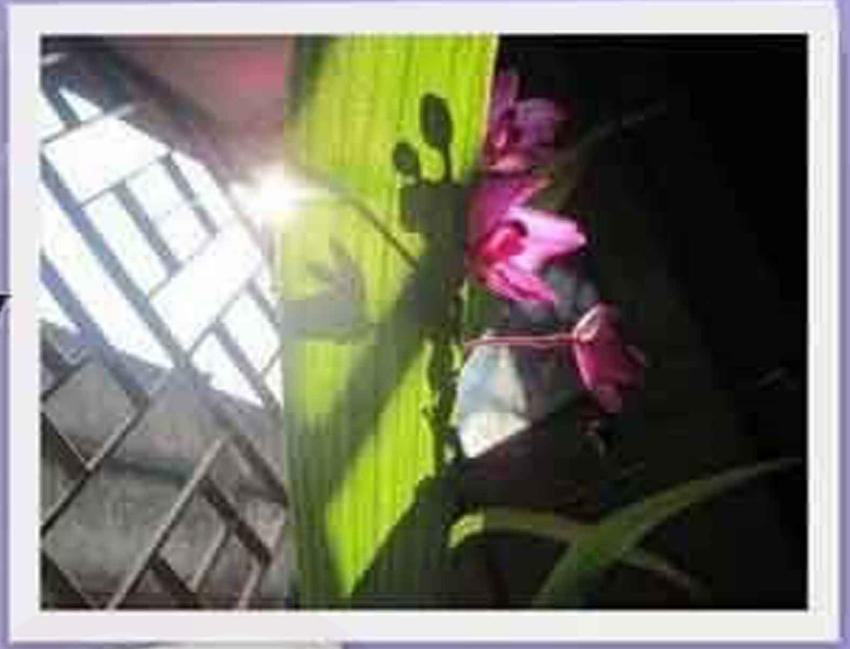
সূর্য ডোবার পালা
-শান্তনু দত্ত

মন, তুই বড়ই চালাক
-আখর বন্দোপাধ্যায়

গল্প
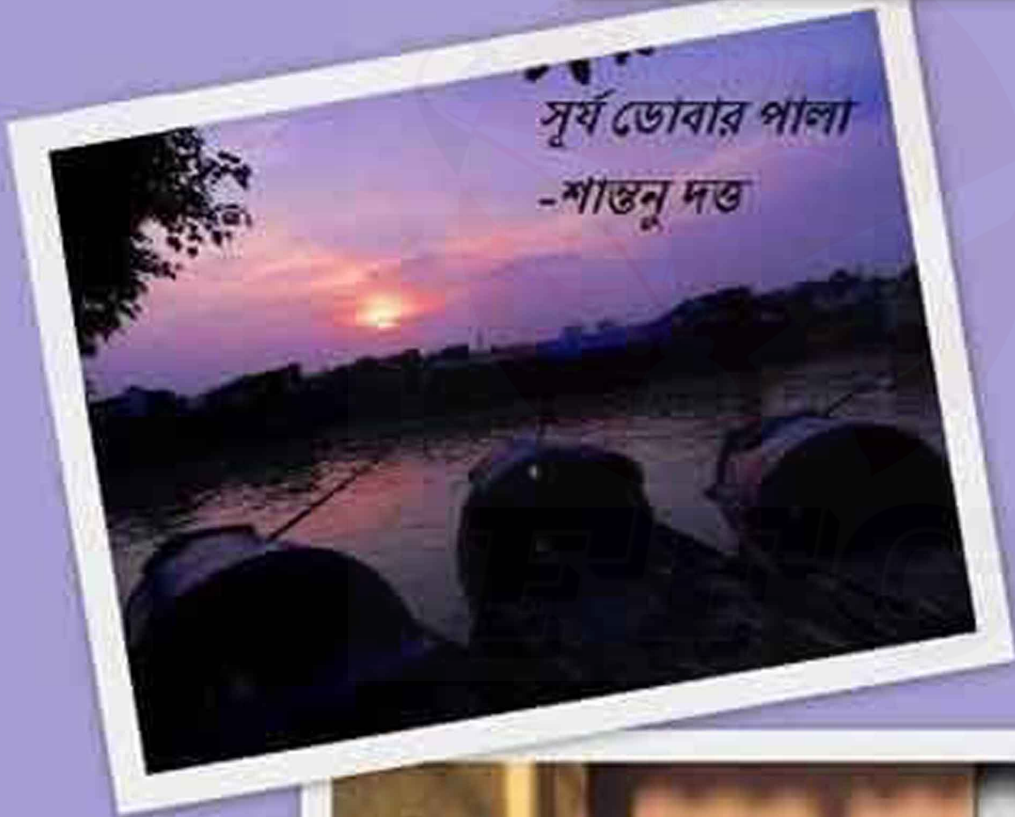
অফিস থেকে বেরিয়ে দিগন্তবাবু বেলেঘাটা ক্রসিং থেকে একটা শাটেল ধরলেন। উঠেই দেখলেন গাড়ির পেছনের সাইটে একজন সহযাত্রী বসে আছেন। লোকটাকে সেরকম পরিষ্কার দেখা গেল না। কারণ গাড়ির মধ্যে আলোটা বন্ধ ছিল। ভদ্রলোক একটা ব্লেজার পরেছেন। জানালার ধার ঘেঁষে বসেছেন। রাস্তার আলোতে মুখটা এবার কিছুটা বোঝা গেল। টিকলো নাক, টানা চোখ জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে বাঙালি বলে মনে হল না। ভীষণই অবাক কান্ড। ভদ্রলোক একবারও তাঁর দিকে তাকালেন না। জানালার বাইরের শহরটা দেখতেই যেন তিনি ব্যস্ত। ভারী অদ্ভুত লাগলো লোকটাকে কেন জানি না। মেট্রোপলিটন সিটি আসতেই ভদ্রলোক বললেন, এখানেই সাইড করে দিন। এই বলে উনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে রাস্তার মানুষের ভিড়ে মিশে গেলেন। হঠাৎ প্রচুর মানুষের চিৎকার শোনা গেল আমার আশেপাশে। হঠাৎ দেখলাম অচেনা ভদ্রলোক বাইরে থেকে গাড়ির জানালার ভিতর উঁকি মেরে বললেন আপনি কি আমাকে ভাবছেন? আমি কোনো ভাবনার বস্তু নই। হি হি হি। এবার নেমে পড়ুনতো গাড়ি থেকে আমার সঙ্গে চলুন গোরস্থানে খুব মজা হবে.....দুজনে মাইল এক সাথে থাকব......হি.......হি.......হি......,

এসে গেছে........এই যে এসে গেছে রুবি হসপিটাল। ধরফড়িয়ে উঠে দেখলেন অফিসের কাজের চাপে এতই ক্লান্ত যে চোখটা কখন যেন লেগে এসেছিল খেয়াল করেননি। গাড়ির দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে টাকাটা মিটিয়ে নিজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ শাটেলের ড্রাইভার বলল, এই যে দাদা শুনুন আপনার জিনিস ফেলে যাচ্ছেন তো। অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে তিনি বললেন আমার জিনিস? গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন সত্যিই তো একটা কালো রঙের দূরবীন পেছনের সিটে পড়ে রয়েছে। এটা আমার না বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে দূরবীনটা তিনি নিয়ে নিলেন। এবার তিনি বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন। এমন একটা দূরবীনের শখ তাঁর অনেক দিনের। কিন্তু দামের জন্য হয়ে উঠছিল না। হঠাৎই এক প্রতিবেশী বেনুগোপাল মিত্রের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, কি দিগন্ত এত দেরী হলো

অফিস থেকে ফিরতে? ভদ্রলোক মাঝ বয়সী। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর রাস্তায় নাইট ওয়াক করতে বের হন। নাহলে ওনার নাকি ঘুম আসে না। খাবার হজম হয় না। বয়স হলে যা হয়। দিগন্তবাবু ওনাকে বললাম, হ্যাঁ একটু কাজের চাপ পড়েছে। বলে বাড়ির তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। মানুষ বলতে বাড়িতে তিনি একা। একটি চাকর আছে। তবে সে দেশে গেছে। আপাতত নিজেকেই হাত পুড়িয়ে খাবার রান্না করতে হচ্ছে কদিন। গা হাত পা ধুয়ে ঘরের একটা পুরনো আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। রান্নাটা সকালেই তিনি অফিসে যাওয়ার আগে করে গেছিলেন। এখন শুধু গরম করলেই হবে। চোখটা লেগে এসেছিল কিছুক্ষনের জন্য আবার। পাড়ার নেড়ি কুকুর ভুলুর ডাকে তিনি সজাগ হলেন ,কেদারাটা ছেড়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানালার পাশের টেবিলটার উপর থেকে দূরবীনটা নিয়ে তিনি চোখে লাগলেন এবং জানালার বাইরে তাকালেন। দেখলেন বাইরেটা কি করে জানি সকাল হয়ে গেছে। আর ভুলু মারা গেছে। আর তাঁর মুখ থেকে কিছুটা রক্ত বেরিয়ে রাস্তাতে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরবীন থেকে তখুনি তিনি চোখ সরিয়ে দেখলেন যে ভুলু দিব্যি বেঁচে আছে এবং লেজ নাড়িয়ে চিৎকার করছে। অবাক কান্ড তো এ আবার কি রকম অদ্ভুত ঘটনা। আবার হয় নাকি? তিনি বার বার দূরবীনটা দিয়ে বাইরেটা যখন দেখলেন তখন ওই দৃশ্য আর দূরবীনটা থেকে চোখ সরিয়ে নিলে আরেক দৃশ্য তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে। এ কি করে সম্ভব? কুকুরটি দিব্যি বেঁচে আছে। এটা কি ম্যাজিক নাকি? নাকি দূরবীনটা অন্য কিছু বলতে চায় তাঁকে? কে জানে? সেদিন রাতে দিগন্তবাবু রাতের খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ঘুম এলো না। ঘুম আয় আয় করতে করতে সারারাত কেটে গেল। ভোরের দিকে কখন তিনি ঘুমিয়ে পরেছিলেন তা তিনি জানেনেই না। অ্যালার্ম ক্লকটা বেজে উঠতেই তাঁর ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ কচলাতে কচলাতে হঠাৎ তাঁর কানে এসে পৌছল যে রাস্তায় বেশ হইচইয়ের আওয়াজ। তিনি বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে দেখলেন রাস্তায় বেশকিছু লোক দাড়িয়ে হই চই করছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। পাড়াতে দিগন্তবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, কালকের সেই ভুলু মারা গেছে। আর তাকে ঘিরে কিছু লোক বলাবলি করছে, কে যে এই অবস্থা করলো কুকুরটার কে জানে। ওকে কেউ বিষ দিয়েছে মনে হয়। এসব বিভিন্ন মতামত বিভিন্ন জন দিচ্ছিল। ভুলু পাড়ার একটা বিশ্বস্ত কুকুর ছিল। তাই দিগন্তবাবুও আদর করে মাঝে মাঝে বিস্কুট, ডাল, ভাত, মাংস খাওয়াতেন। কিন্তু ওর এরকম অবস্থা দেখে তিনি ভিড়ের মধ্যে থেকে বেড়িয়ে এলেন। তাঁর অজান্তেই চোখটা ভিজে এল। তারপর প্রতিদিনের মত অফিসে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু অন্যদিনের মত সেভাবে তিনি কাজ করতে পারলেন না। ভুলুর নিষ্পাপ মুখটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আজ তাড়াতাড়ি তিনি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। ব্যলকনিতে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ দেখলেন বেনুগোপাল মিত্র নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি যেন মনে হলো দিগন্তবাবুর। তিনি তাঁর দূরবীনটা নিয়ে বেনুগোপাল মিত্রের দিকে ধরে দেখলেন বেনুগোপাল মিত্রের পা ভেঙ্গে গেছে। আর পাড়ার কিছু যুবক তাঁকে ধরাধরি করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছে। তিনি দূরবীনটা থেকে চোখ সরিয়ে দেখলেন। না ভদ্রলোক দিব্যি হেঁটে যাচ্ছেন। আবার দূরবীনটায় চোখ লাগিয়ে তিনি ওনার পা ভাঙার ঘটনা দেখলেন। অদ্ভুত ব্যাপার তো। এটা কি হচ্ছে? তা হলে কি এটা সাধারণ দূরবীন নয়! এটা কি বলতে চায় আমাকে? সেদিন রাতে তাঁর চোখে ঘুম এলো না। পরের দিন তিনি অফিসে বেরলেন প্রতিদিনের মত। কিন্তু অফিসে গিয়ে কাজে মন বসাতে পারলেন না। অফিসে ম্যানেজার তাকে দুতিনটে কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁকে চুপচাপ শুনতে হল কথাগুলো। কিন্তু কি করবেন তিনি। তাঁর মাথাতে তো দূরবীনের অদ্ভুত ছবি

ঘুরছে। অফিস থেকে ফেরার পথে তিনি দেখলেন বেনুগোপাল মিত্রের পথ দুর্ঘটনায় গাড়ি চাপা পড়ে পা ভেঙে গেছে। তাঁকে পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছে। তাঁর গা শিউরে উঠল এই ঘটনাটা তো তাঁর জানা। এটাই তো গতকাল রাতে তিনি দূরবীন দিয়ে দেখেছিলেন। তারপর তিনি দেখলেন আকাশ মাটি সবই কেমন জানি লাট্টুর মত ঘুরছে। তারপর আর মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল তিনি দেখলেন তাঁর ঘরের বিছানাতে শুয়ে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে জনা কয়েক পাড়ার ছেলে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন আমার কি হয়েছিল? পাড়ার ছেলে ফন্টে বলল আপনি বেনুগোপাল মিত্রের অবস্থা দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। আপনার পকেটে আপনার ঘরের চাবি ছিল। তা দিয়ে ঘর খুলে আপনাকে ঘরে নিয়ে আসলাম আমরা। মাথায় জল দেওয়াতে আপনার জ্ঞান এলো। দিগন্তবাবু বললেন আসলে আমার রক্ত দেখা একদমই অভ্যেস নেই। আর একজন পরিচিত মানুষের এরকম অবস্থা তো আরো না। রাতেরবেলা পাড়ার ছেলেরা যে যার মত বাড়ি চলে গেলে তিনি বিছানা ছেড়ে আরাম কেদারায় গিয়ে বসলেন। এবার বুঝেছি দূরবীনটা সত্যিই দূরের জিনিস দেখতে সাহায্য করে। মানে এ দূরবীন, ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা দেখতে সাহায্য করে। আর ভবিষ্যত তো সত্যিই দূরের জিনিস। ভুলুর ভবিষ্যৎ, বেনুগোপাল মিত্রের ভবিষ্যৎ তিনি দেখলেন। অর্থাৎ এই দূরবীনটা দিয়ে যাকেই দেখা যাবে এ দূরবীন তাঁরই ভবিষ্যৎ বলবে। তাহলে আর কি, একটা ব্যবসা শুরু করা যায় তো। হুম মানুষের ভবিষ্যৎ বলে বেশ ভালো টাকা ইনকাম করা যাবে। এই বলে তিনি আরাম কেদারাটা ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। অবশেষে বাড়ির এক তলায় একটি ফাঁকা ঘরে তিনি জ্যোতিষচর্চা শুরু করলেন। জ্যোতিষ চর্চা করার জন্য তিনি মহামায়া জ্যোতিষ কার্য্যালয় নামে একটি সাইন বোর্ড লাগালেন দরজার সামনে। প্রথম প্রথম বেশি লোক আসত না। শনি রবি এই দুটো ছুটির দিন ভবিষ্যৎ বলার দিন হিসেবে ঠিক করলেন। যত দিন যেতে লাগলো তত পসার বাড়তে লাগলো। তাঁর কাছে কোনো ব্যক্তি যেই আসত, তিনি তখন দূরবীন দিয়ে তাঁর দিকে দেখতেন। আর তখন তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটনা ঘটবে তা দূরবীনের সাহায্যে দেখতেন। দূরবীনের মাধ্যমে যা তিনি দেখতেন সেটাই তিনি বলতেন। এমন অবস্থা হল যে তিন মাস যেতে না যেতেই এক জন অ্যাসিস্টান্ট রাখতে হল। তাঁর ক্লায়েন্টদের নামের বুকিং-এর জন্য। ব্যবসাটা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো দিন দিন। তিনি ভাবলেন তাঁর পিতৃপুরুষের বাড়িটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। একটা নতুন ফার্নিশিং গোছানো ফ্ল্যাট পেলে মন্দ হত না। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি একটা নতুন ফ্ল্যাটও কিনে ফেললেন তাঁর অফিসের কাছে। তিনি এই পুরনো বাড়িটাও সারাবেন বলে ঠিক করলেন। ছয় মাস পর তাঁর ক্লায়েন্টের সংখ্যা এতই বাড়ল যে তিনি ওই দু দিন খাওয়া দাওয়া করার সময় পেতেন না। হঠাৎ একদিন বেনুগোপাল মিত্র তাঁর জ্যোতিষ্কার্য্যালয়ে এসে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে বললেন বসুন বসুন। যা ঝড় গেল আপনার উপর দিয়ে। এখন কেমন আছেন? তিনি বললেন, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। হুম যা বলেছ। আচ্ছা দিগন্ত সবার ভবিষ্যৎ-ই তো বলছ আর ঠিক মত সবই তো মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কি নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারবে? সত্যি তো, তিনি এ ব্যাপারে কোনোদিন কিছু ভাবেননি। রাতে তিনি নিজের ঘরে এসে এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। আর তক্ষুনি তিনি দূরবীনটা নিয়ে আয়নাটার সামনে নিজেকে দেখতে গিয়ে দেখলেন,আয়নাটা ভেঙে গেছে। দূরবীনটা থেকে চোখ সরিয়ে দেখলেন যে আয়নাটা ভাঙেনি ঠিকই আছে। তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না দূরবীন তাকে কি ভবিষ্যৎ বলছে? এটা কি হচ্ছে তিনি তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

পরের দিন সকালে তিনি অফিসে প্রতিদিনের মত বেরিয়ে গেলেন। অফিসে বসে দিব্যি

কাজ করছেন। দুপুরবেলা হঠাৎ চেয়ারটা যেন নড়ে উঠলো। কাজের টেবিলে রাখা জলের গ্লাস তাঁর জলটা মৃদু দুলছে এখনো। কম্পিউটারটা বন্ধ হয়ে গেল। অফিসে আশেপাশের চেয়ারে যারা বসেছিলেন তারা সবাই বলাবলি করতে লাগলো সামান্য ভূমিকম্প হলো। কিছু পর ম্যানেজার বাবু এসে বললেন টিভিতে বলছে সামান্য ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। আজ সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে দেখে দিগন্তবাবুও বিকেল বেলাতে শাটেল ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। পাড়ার কাছাকাছি এসে দেখলেন পাড়ার কিছু বাড়ি ধ্বসে গেছে। যেন একটা ধংসস্তুপের সৃষ্টি করেছে। এবং প্রেসের কিছু লোক খবর সংগ্রহ করার জন্য এসেছে। কেউ কেউ লাইভ টেলিকাস্ট করছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল তাঁর বাড়িটা তো বহু পুরনো। তাঁর বাড়িটার অবস্থা কেমন তা দেখার জন্য সে দ্রুত নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন তাঁর বাড়িটা এতই পুরনো যে সামান্য ভুমিকম্পে তা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, আরে দূরবীন তো ঘরের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওটা খুঁজে বার করতে হবে। এই ধ্বংসস্তূপে যে ওটা কোথায় পরে আছে তা কে জানে? তৎক্ষনাৎ তাঁর দূরবীন তিনি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হাতরে হাতরে খুঁজতে লাগলেন। এক টুকরো কাঁচ তাঁর পায়ে ঢুকে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। একটু দূরে তিনি দেখলেন তাঁর ঘরের আলমারির আয়নাটা ভেঙে গেছে। তিনি বুঝে গেলেন আয়নাটার ভবিষ্যৎই তাহলে কাল রাতে দূরবীনটা দেখিয়েছিল। তিনি আরও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন দূরবীনটা খুঁজে পাওয়ার জন্য। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটা ভাঙা থামের নিচে দূরবীনটার কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। তিনি দেখলেন দূরবীনটা একেবারে ভেঙে গেছে। ওটা দিয়ে আর কিছু দেখা যাবে না। তাঁর চোখের কয়েক ফোঁটা জল পড়ল দূরবীনটার উপর। হঠাৎ পেছন থেকে বেনুগোপাল মিত্র ডাকলেন, ওহে দিগন্ত কি হয়ে গেল? দিগন্তবাবু দূরবীন তাঁর ধ্বংসস্তূপে ফেলে বেনুগোপাল মিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। বেনুগোপাল মিত্র বলছিলেন এত দিনের পিতৃ পুরুষের বাড়ির আজ এই দশা হবে তা কি কেউ ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর কোনও কথাই যেন দিগন্তবাবুর কানে ঢুকছিল না। সব কিছু যেন তাঁর কাছে অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। কিছুটা দূরে তিনি একটি ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। ভদ্রলোকটি ব্লেজার পড়ে আছে। আর তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। লোকটাকে কোথায় যেন সে দেখেছে। সেই চেনা পোশাক। সেই চেনা অবয়ব। তাঁর মনে পরে গেল এক রাতে অফিস ফেরত সেই সহযাত্রীটির কথা। তিনি যেদিন দূরবীনটা হাতে পেয়েছিলেন। ভদ্রলোক তাঁকে দেখে হাসছেন। তাঁর হাতে দিগন্তবাবু নিজের দূরবীনটা দেখে বেশ অবাক হলেন। দিগন্তবাবুকে দূর থেকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে লোকটি দ্রুত তাঁর পাড়া থেকে বেড়িয়ে গেলেন মেন রোডে। দিগন্তবাবু অচেনা ভদ্রলোকটির পেছন পেছন ছুটতে লাগলেন, দেখলেন লোকটি দূরবীনটা হাতে একটি শাটেল কারে উঠে পড়ল। চলন্ত শাটেল কার থেকে তাঁকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে গাড়িটা কলকাতার ট্রাফিকের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ক বি তা

অনাবিষ্কৃত

অ রি ন্দ ম ই ন্দু
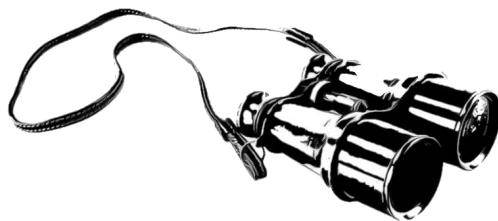
যে পথ ধরে কমললতা চলে,
সে পথখানির শিশিরবিন্দু দিয়ে
অন্ধ ফকির সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে।

আমিও ছিলাম সেই পথের আশায়।
যতবার ভাবি পেয়েছি এবার,
তাকিয়ে দেখি অভ্রমাখা পথ;
মিথ্যে মানবী নিয়ে যেতে চায়
মিথ্যে প্রেমের বাসায়।

১০০ নং গড়পার রোড : ১

চিত্রগ্রাহক : চিরঞ্জিত দাস

জন্ম:- ২.৫.১৯২১

মৃত্যু:- ২৩.৪.১৯৯২

— মহারাজা তোমারে সেলাম —

শুধু [illegible] যাঁর পথের পাঁচালী সীমাবদ্ধ ছিল না

জলসাঘর থেকে চিড়িয়াখানা, [illegible] থেকে সোনার কেল্লা,

যে অ-প্রতি-দ্বন্দ্বী আগন্তুকের ঘরে-বাইরে সমান এক্তিয়ার।

সেই অপরাজিত নায়ক

ভারত রত্ন "সত্যজিৎ রায়" এর

জন্মস্থানে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ফলক স্থাপিত হইল ॥

সৌজন্যে "অগ্রদূত"

২০.১০.১৯৯৩ (দুর্গা-পঞ্চমী)

(১)

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একটা মোড় পেরিয়েই ছোটমামা আমাকে বলল - "গাড়িটা দিব্যি আরামদায়ক। কি বলিস অনি? "

আসলে ছোটমামা যে এতো ভালো ড্রাইভিং জানে তা আমার জানা ছিল না। যদিও আগে কোনদিন ছোটমামার সাথে লং ড্রাইভ যাওয়াই হয় নি।

এখানে আমাদের মামা-ভাগ্নের পরিচয়টা একটু দিয়ে রাখি। আমার ছোটমামার আসল নাম নীলধ্রিজ বর্মন। আপাতত একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করছে বটে। তবে ওর ধ্যান জ্ঞান, নেশা, শখ হলো একমাত্র গোয়েন্দাগিরি। স্যার কোনান ডয়েল থেকে শুরু করে শরদিন্দুবাবু, মানিকবাবু, নীহারবাবু বলতে গেলে গোয়েন্দা জগতের সমস্ত লেখকের লেখাই ওর গুলে খাওয়া হয়ে গেছে। ছোটখাটো রহস্য সমাধানও করেছে। আর আমি হলাম ওর সবচেয়ে কাছের লোক। সবাই বলে আমি আমার গোয়েন্দামামার সহকারী। মামাও তাই মেনে নিয়েছে। আমার নাম অনিরুদ্ধ সেন। সবে কলেজে উঠেছি। বাবা মা কর্মসূত্রে প্রবাসী। কিন্তু আমি আমার দেশ ছেড়ে যাইনি। মামাবাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করি।

অ্যাডভোকেট বড়মামার কেনা নতুন স্যানট্রো গাড়িতে আমি আর ছোটমামা যাচ্ছি কৃষ্ণনগর, আমার পিসির বাড়ি। উদ্দ্যেশ্য শুধুমাত্র কিছুদিনের জন্য আমার কলেজ আর ছোটমামার কাজ থেকে অব্যাহিত।

গাড়ি দিব্যি ছুটে চলছিল ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে। কিন্তু হঠাৎ করেই মামা গাড়ির গতি কমিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড় করলো। তারপর ঝটপট গাড়ি থেকে নামতে নামতে আমাকে বললো- "জলের বোতলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়।"

আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না। মামার আদেশ মত জলের বোতল নিয়ে গাড়ির পেছন দিকে রাস্তার ধারে একটা ঝোপের দিকে এগোলাম। দেখি ছোটমামা সেই ঝোপের পাশ থেকে প্রায় অচেতন এক যুবককে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। অচেনা যুবকটির পরনের দামী শার্ট প্যান্ট ঝোপের কাঁটায় ছিঁড়ে গেছে বিভিন্ন জায়গয়। কপালের বা-পাশে কেটে গিয়ে রক্ত পরে শুকিয়ে গেছে। যুবকটির বয়স আনুমানিক ২৫ কি ২৬, ছোটমামার থেকে দু বছরের ছোট তো হবেই।

বোতল থেকে জল নিয়ে যুবকটির মুখে ছেটানোর পর সে চেতনা ফিরে পেল। তাকে গাড়ির পিছনের সীটে বসিয়ে ফাস্ট এইড লাগাতে লাগাতে ছোটমামা বললো - "আমার থেকে বয়সে ছোট বলেই মনে হচ্ছে, তাই তুমি করেই বলছি। তোমার নাম কি? আর এখানে এভাবে পড়েছিলে কেন?"

"আমার নাম ভুবন মজুমদার" বলে যুবকটি চুপ করে রইলো।
ছোটমামা আবার জিজ্ঞেস করলো "কিন্তু এখানে এলে কিভাবে? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল নাকি?"
এবার যুবক মাথা নিচু করে বললো "কাল রাতে বন্ধুদের সাথে জুয়ায় --" ছোটমামা থামিয়ে দিয়ে বললো- "ব্যাস, ব্যাস বুঝেছি। এখন বল থাকো কোথায়? তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি "
-"ব-বন্দুকবারী"
-"বন্দুকবারী-" আমি আর ছোটমামা বাড়ির নাম শুনে অবাক হয়েছি দেখে ভুবন মজুমদার বললো "হ্যাঁ বন্দুকবারী। কৃষ্ণনগর রেল স্টেশনের কাছে। নাম বললেই সকলে চেনে"

(২)

সত্যিই বন্দুকবাড়ির নাম সকলেই জানে। তবে বন্দুকবাড়ির প্রকৃত নাম 'বন্দুকবাড়ি' নয়। 'কমলাকান্তনিবাস' সেটা জানা গেল বাড়ির সদর দরজায় নামের ফলক দেখে। বাড়ি না বলে অট্টালিকা বলাই ঠিক হবে। বেশ পুরনো। কিন্তু দেখে বোঝা যায় অনেকবার মেরামতি হয়েছে, তাই বোধহয় বার্ধ্যকের ছাপ পড়েনি। একজন ভৃত্যস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের গাড়ি দেখে দৌড়ে এলো। তারপর উঁকি দিয়ে ভুবনকে দেখে সদর দরজা খুলে দিলো।
গাড়ি থেকে নেমে ঘরের দরজার কাছে যেতেই এই প্রবীণ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বয়স ষাট-বাষট্টি হবে। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। কড়া ধমকের সুরে ভুবনকে প্রশ্ন করলেন তিনি -"কোথায় ছিলি তুই?"
ভুবনকে অপরাধীর মত চুপচাপ থাকতে দেখে ভদ্রলোক বোধয় সমস্ত কিছু অনুমান করে আচমকা ভুবনকে এক চড় মারলেন। বললেন -"হতচ্ছারা! নিজের ঘরে যা"।
ভুবন চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন -"আপনারা কিছু মনে করবেন না। কতবার ওকে ওইসব ফালতু বন্ধুদের সাথে মিশতে বারণ করেছি। আমার কথা শোনেই না। আপনারা আসুন ভেতরে আসুন"।
ভদ্রলোকের সাথে আমরা বসার ঘরে গেলাম। আর সেখানে গিয়েই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে এত বন্দুকের বাহার একমাত্র মিউজিয়ামেই দেখা যায়। ছোটোমামাও ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো।
বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন -"নমস্কার ! আমি মনমোহন মজুমদার। ভুবনের জ্যাঠামশাই"।
ছোটমামাও হেসে নমস্কার জানিয়ে আমাদের দুজনের পরিচয় দিলো। তারপর বলল-"আপনার বাড়িকে কেন বন্দুকবাড়ি বলা হয় বুঝতে পারছি"।
মনমোহনবাবু বললেন-"আসলে এগুলো আমার প্রপিতামহ কমলাকান্ত মজুমদারের সংগ্রহ। এই বাড়িও ওনারই তৈরি। এক কালে যেমন জমিদারী করেছেন তেমনি শিকারও করেছেন অনেক। এই ঘরেই একসময় বাইসন, হরিন, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের স্টাফ করা মাথা সাজানো থাকত"।
ইতিমধ্যে মনমোহনবাবুর ভৃত্য চা নিয়ে এসেছেন। ছোটমামা চায়ে চুমুক দিয়ে আমাকে একটা বিশেষ বন্দুকের দিকে নির্দেশ করে বলল-"ওটা কি বন্দুক বল তো?"
আমি দেওয়ালে ঝোলানো বন্দুকটা দেখে চিনতে পারলাম। বললাম-"ওটা তো সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার এনফিল্ড রাইফেল "।
ছোটমামা আবার চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়লো। মনমোহনবাবু বললেন -" বাহ ! আপনার ভাগ্নের জ্ঞান আছে বেশ। আমার আবার এত সব মনে থাকে না "।
ছোটমামা বলল-" স্প্রিংফিল্ড, ন্যাজেন্ট, ম্যান্ লিখার অনেক রকমরী পুরনো বন্দুকের কালেকশন দেখছি, সবই নিশ্চয় আপনার প্রপিতামোহের সংগ্রহ নয়?"

-"কিভাবে বুঝলেন?"

-"বেশ কয়েকটা বন্দুক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার;"

-"ঠিকই ধরেছেন। কমলাকান্ত মজুমদারের শখ উত্তরাধিকার সুত্রে আমার বাবা আর আমিও পেয়েছি। এসবের জন্য লাইসেন্স রিনিউ করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমার অবর্তমানে এসব নিলাম করার ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

-"আপনার রিভলভার বা পিস্তলের কালেকশন নেই?"

-"হ্যাঁ, থাকবে না কেন! লুয়গার, নফলার, কোল্ট সবরকমই আছে।।। দাঁড়ান। আপনাদের একটা জিনিস দেখাই।"

মনমোহনবাবু উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা কাঠের ছোট ক্যাসকেড নিয়ে এলেন। তার ভিতর থেকে একটা পুরনো আমলের পিস্তল বের করে আমাদের সামনে রাখলেন। পিস্তল দুটোর বাদামী রং, কাঠের তৈরি। নলের মুখ, হ্যাঁমার, ট্রিগার আর হাতলের নিচের চাকতি পিতলের। লম্বায় প্রায় একহাত, পাইরেটস অফ ক্যারিবিয়ান সিনেমায় এরকম বন্দুক দেখেছি।

মনমোহনবাবু বললেন -"এটার নাম কি বলুন তো"?

-"ফ্লিনলক।" বললো ছোটমামা।

-"বন্দুক সম্পর্কে সবই জানেন দেখছি। এই সেটটা কিছুদিন আগে কিনেছি। খুব সস্তায় পেয়েছি, তাই ছাড়তে পারিনি।"

-"কতো দাম নিয়েছে জানতে পারি? "

-"মাত্র দশহাজার।"

-"যিনি আপনাকে বিক্রি করেছেন তিনি এর সঠিক মূল্য জানেন না।"

-"ঠিক তাই। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন, প্রকাশ স্যান্যাল। তার কাছ থেকেই পেয়েছি।"

ছোটমামা বললো -" ঠিক আছে, আজ উঠি আপনার সাথে আলাপ হয় আর বন্দুকবাড়ি দেখে খুবই ভালো লাগলো"

আমরা নমস্কার বিনিময় করে বেরিয়ে পরলাম। রাস্তায় মামাকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না-"মনমোহনবাবুর সোর্স অফ ইনকাম কি? এতবড় বাড়ি, অতো বন্দুকের পিছনে খরচা করতেও তো অনেক টাকা লাগে।"

ছোটমামার নিরুত্তাপ জবাব-" ইট-বালি-সিমেন্ট বিক্রি করেন বুঝলি?"

-"মানে"

-"শুধু কি বন্দুন দেখলেই হবে দরজার পাশে ক্যালেন্ডারটা দেখিসনি? 'মজুমদার বিল্ডার্স' প্রো : মনমোহন মজুমদার। এবার বুঝেছিস?"

বাপরে বাপ! কি অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। ছোটমামা আবার গাড়িটা থামালো, কারণ আমরা তখন পিসির বাড়ির সামনে।

(৩)

অনেকদিন পর পিসির বাড়ি এসে ভালোই লাগছে। কৃষ্ণনগরে দেখার মতো বেশ কয়েকটা জিনিস আছে। যার মধ্যে একটি হলো মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয় পিসেমশাই-এর কাছে শুনলাম সেই রাজবাড়ি একমাত্র দুর্গাপুজোর সময়ই ঘুরে দেখার সুযোগ মেলে। তবে রেলস্টেশন থেকে কিছু দূরে খ্রিস্টান মিশনারির চার্চ আছে। খুব ভালো জায়গা। আমি আর মামা সেখানেই ঘুরতে যাব বলে স্থির করলাম।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ চার্চ দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। এবার আর স্যানট্রো নিয়ে বের হইনি, পিসির বাড়ির সামনে থেকেই রিক্সায় চেপে বসলাম। কৃষ্ণনগরের সরভাজা নাকি জগতবিখ্যাত একথা ছোটমামাই বলেছিল তাই কিনে খেতেও দেরী করিনি। ডন বস্কো স্কুলের পাশ দিয়ে আমাদের রিক্সা যখন যাচ্ছে, তখন হুশ করে প্রথমে একটা

পুলিশ জীপ তারপর একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে গেলো। ছোটমামা রিক্সাওয়ালাকে বললো -"কি ব্যাপার বলত ভাই। এত সকালে পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স একসাথে? কথাও হয়েছে নাকি?"

রিক্সাওয়ালার উত্তর শুনে চমকে উঠলাম-" বন্দুক বাড়ির কর্তা খুন হয়েছেন। বেয়াদপ ভাইপোটার সাথে কাল রাতে খুব ঝামেলা হয়ছিলো। তারপর আজ সকালে ওনার চাকরের কান্নাকাটি শুনে সবাই দেখে এই কান্ড। ভায়পোটাও কোথায় পালিয়েছে।

ছোটমামা ব্যস্তভাবে বললো-" তাড়াতাড়ি বন্দুকবাড়ি নিয়ে চলো।"

-"আপনি ওনাকে চিনতেন নাকি?"

-"হ্যাঁ, তুমি কথা না বলে তাড়াতাড়ি চলো"

মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা বন্দুকবাড়ির সামনে হাজির হলাম। বাড়ির সামনে লোকজনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। অনুরোধ করা সত্তেও একজন কনস্টেবল

আমাদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল দেখে পুলিসের বড়বাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। দূর থেকে যে তিনি আমাদের দিকে দেখেছেন সেটা আগেই লক্ষ্য করেছি। তিনি এসে ছোটমামাকে ভালোমতো দেখে ভুরু কুঁচকে বাঙাল ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন -" আপনে কি জয়ধ্বজ বর্মনের কেহ লাগেন বুঝি? চেনা চেনা লাগতাসে।"

আমরা দুজনেই অফিসারের জামায় লাগানো নেমপ্লেট টা দেখেছি। ছোটমামা উত্সাহিত হয়ে বললো-"হ্যাঁ, আমি নীলধ্রিজ বর্মন। জয়ধ্বজ বর্মনের ছোট ভাই। আপনি তো রঙ্গলাল চক্রবর্তী, আমার দাদার স্কুলের বন্ধু ছিলেন। আপনার কথার টানেই আপনাকে চিনেছি।"

-"আমিও ঠিক চিনতে পারসি। তা এখানে হঠাৎ কি মনে কইরা?"

ছোটমামা অফিসারকে আমার পরিচয় দিলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই আমি সংক্ষেপে মনমোহনবাবুর সাথে আমাদের আলাপের কথা জানিয়ে এখানে আসার আসল উদ্দ্যেশ্যটা বুঝিয়ে দিলাম।

রঙ্গলালবাবু বললেন-"তদন্ত করবা করো। কিন্তু যা ক্লু পাবা আমারে জানাইতে ভুলো না।"

ছোটমামা সর্তে রাজি হলো। বড়বাবু আমাদের নিয়ে গতকালের সেই বসার ঘরে এলেন। মনমোহনবাবুর মৃতদেহ আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা যে সোফায় আগের দিন বসেছিলাম সেই সোফাতেই একপাশে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।

ছোটমামা রঙ্গলালবাবুকে প্রশ্ন করলেন-"খুনটা কিভাবে হয়েছে?"

-" কিসের আঘাত বুঝতে পারতাসি না। ওয়েপেন আমরা পাই নাই। তবে মনে হইতাসে ভোতা আর শক্ত কোনো জিনিসই হইবা। মাথার দিনে বারবার আঘাতের ফলেই মৃত্যু হইসে।"

-"কাউকে জেরা করে কিছু পেলেন? মানে খুনের উদ্দশ্য কি প্রতিহিংসা নাকি চুরি?"

-"চুরি একটা হইসে।"

-"কি জিনিস"

পিছন থেকে একজন উত্তর দিল-"নতুন কেনা সেটের একটা ফ্লিনটক।" তারপর সেই মধ্যবয়স্ক ভাদ্রলক এগিয়ে এসে বললেন-"আমি বিক্রম সান্যাল। মনমোহনবাবুর ব্যবসা দেখাশোনা করি।"

ছোটমামাও নিজের পরিচয় নিয়ে বললো " আপনি বোধহয় গতকাল এখানে ছিলেন না?"

-"না,আমার দিদি অসুস্থ। তাই শান্তিপুর গেছিলাম দিদিকে দেখতে। এ বাড়ির চাকর দেবুদার ফোন পেয়ে ভোরবেলায় এসেছি। "

-"আপনার আর মনমোহনবাবুর রিলেশান কেমন?"

-"খুবই ভালো। আপনি যেকোনো কাউকে জিগেস করতে পারেন।"

-"আপনার কি মনে হয়, ভুবন এই চুরি আর খুন করতে পারে?"

-"খুন করা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। প্রায়ই তো ঝামেলা হতো দুজনের মধ্যে। তাছাড়া ও যদি কিছুই না করে থাকে, তবে পালালো কেন?"

-"হুম, আপনার কাছে ফ্লিনটকের পুরনো মালিকের ঠিকানা আছে?"

-"হ্যাঁ তা আছে। একটু দাঁড়ান দিচ্ছি।"

বন্দুকের পুরনো মালিক প্রকাশ স্যান্যালের ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে বিক্রমবাবু বললেন -" আমার মনে হয় প্রকাশবাবু একটু খামখেয়ালী লোক। না হলে একজোড়া এরম পিস্তল কি কেউ মাত্র দশহাজার টাকায় বিক্রি করে?"

-"আচ্ছা আমরা আবার আসব। দেবুদার মনের অবস্থা ভালো নয়। ওকে পরে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি।"

ছোটমামা জেরা শেষ করে বন্দুকবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আমি জিজ্ঞেস করলাম -" তোমার কি মনে হয় ভুবনই এই কাজটা করেছে?"

ছোটমামা আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো-"বিকেলে একবার প্রকাশ স্যান্যালের বাড়ি যেতে হবে।"

(8)

প্রকাশবাবুর বাড়িটার পরিবেশ খুব নিরিবিলি। ছোটমামা দুপুরে ওনাকে ফোন করেছিল। বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় আসতে বলেছিলেন ভদ্রলোক। আমরা ওনার বাড়ির কলিং বেলটা বাজতেই কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ব্যক্তি দরজা খুললেন। বয়স ৪৫ কি ৪৬ হবে। ছোটমামা নমস্কার জানিয়ে বললো-" আমি নীলদ্ধজ বর্মন আর ও আমার ভাগ্নে অনিরুদ্ধ সেন। আপনি কি প্রকাশবাবু?"

-"হ্যাঁ আমি প্রকাশ স্যান্যাল। ভিতরে আসুন। "

প্রকাশবাবুর ঘরদোর বেশ গোছানো। বসার ঘরে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে আমাদের বসতে দিয়ে ভদ্রলোক নিজে বসলেন একটা প্লাস্টিকের টুলে।

আগেই লক্ষ্য করেছি এই ঘরে কাঁচের আলমারিতে অনেক বই রয়েছে।

প্রকাশবাবু বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন-"আপনি আর আপনার এই চশমা পরা দোসরটি কি কাজে এসেছেন সেটা জানালে ভালো হয়। আমাকে আবার সাড়ে ছ'টায় বেরোতে হবে।"

ছোটমামা প্রকাশবাবুর কথা গায়ে না মেখে সরাসরি বললো-" আপনি যে মনমোহন মজুমদারকে কিছুদিন আগে একটি পিস্তল সেট বিক্রি করেছিলেন তিনি গতকাল রাতে খুন হয়েছেন তা জানেন তো?"

-"হ্যাঁ, জানি। আপনারা কি তবে ওনার খুনের তদন্ত করতে এসেছেন নাকি?"

-"ভেবে নিন তাই। আচ্ছা আপনি কথা থেকে ওই সেটটা পেয়েছিলেন?"

-"কথা থেকে পাবো আবার। ওটাতো আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। আমার এক পূর্বপুরুষ ওটা পেয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভের প্রধান এক সঙ্গীর কাছ থেকে। কি যেন নাম ছিল ইংরেজের_"

ছোটমামা বললো -"ওয়াটসন?"

-"না না।"

-"বিচার?"

-"উহু সেও না"

-"কিলপ্যাট্রিক?"

-" হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই কিলপ্যাট্রিক সাহেবের বন্দুক ছিল ওই দুটো।"

-"এতবড়ো একটা ইতিহাসিক জিনিস মাত্র দশহাজারে হাতছাড়া করে দিয়েছেন"

-"হুমম। দামটা একটু কমই হয়ে গেছে। প্রকাশবাবু বললেন।

-" আপনার ওই পিস্তলের সেটের একটা পিস্তল চুরি গেছে। আমার সন্দেহ ওই পিস্তল চুরির জন্যই খুনটা হয়েছে। আপনার কাছে মনমোহনবাবুর আগে কেউ ওটা কিনতে চেয়েছিল বা আপনি কি কাউকে রিফিউস করেছিলেন?"

-" নাহ। একদম না "

-" ঠিক আছে।" ছোটমামা বারবার প্রকাশবাবুর বাহাতের চেনওয়ালা ঘড়িটার দিকে দেখছিল। হঠাৎ ও বললো- "আপনার রিস্টওয়াচটা বেশ পুরনো আর দামী মনে হচ্ছে।"

-"হ্যাঁ, ইটা আমার বাবার ঘড়ি। উনি মারা যাওয়ার আগে ইটা আমাকে দিয়েছিলেন। সর্বক্ষনই আমার হাতে থাকে। কিছু মনে করবেন না আজ আমার একটু ভাড়া আছে। আমার জুয়েলারী শপে কিছু কাস্টমারের বিল পেমেন্টের ব্যাপার আছে।"

আমরা উঠে পরলাম। দরজা অবধি এসে ছোটমামা আবার প্রশ্ন করলো প্রকাশবাবুকে-"আপনি কি এই বাড়িতে একাই থাকেন?"

-"হ্যাঁ, কেন বলুনতো?"

এই কথার উত্তর না দিয়ে ছোটমামা আবার জিজ্ঞেস করলো-"মনমোহনবাবুর ভাইপো ভুবনকে চেনেন?"

-"না চিনি না "

-"ওকে। আমরা আজ আসি।"

সারা রাস্তা মামার সাথে কোনো কথা হয়নি। পিসির বাড়ি ফিরে আসার পর বললাম-" তুমি শেষে ভুবনের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?"

-"প্রকাশ স্যান্যালের দরজার বাইরে জুতোগুলো দেখেছিস?" ছোটমামা গম্ভীর ভাবে বললো।

-"জুতো?"

-" হ্যাঁ, জুতো। একজন মানুষ যে বাড়িতে একা থাকে তার দুজোড়া বুটের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। তাও আবার একজোড়া সাত নম্বর অন্যটা আট।"

-"তাই নাকি" আমি বিস্মিত হয়ে বললাম।

-"আট নম্বর বুটে একটা লম্বা সেলাই করা আছে। কিন্তু সাত নম্বরটা ব্র্যান্ড নিউ। সেদিন ভুবনের জুতোটা যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি ওই জুতোটা। "

আমি এবার আরও বিস্মিত হয়ে বললাম -" তবে কি প্রকাশবাবুই ভুবনকে দিয়ে চুরি আর হত্যাকান্ড করিয়েছে? আর এখন তাকে লুকিয়ে রেখেছে? রঙ্গলালবাবুকে খবরটা দেবো?"

-"এখন দেওয়ার দরকার নেই। দাঁড়া আমি একটু সিওর হয়ে নিই। সেরকম বুঝলে আমি জানাবো। লোকটা বেশ খামখেয়ালী আর রহস্যজনক। দুটো বইয়ের আলমারি অথচ বইয়ের শখ বিন্দুমাত্র নেই।"

-"কিরকম?"

-" ম্যাকবেথের পাশে শ্রীমদ্ভগবদগীতা, তার পাশে শরৎরচনাবলী, পরপর আবার একটা ডায়েরি।"

-"হুম, বুঝলাম।"

(৫)

প্রকাশবাবুর বাড়ি থেকে আমরা পিসির বাড়ি ফিরে এসেছিলাম সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যা আমাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনা হিসেবনিকেশ উল্টোপাল্টা করে দিলো। সাড়ে ন'টার সময় আচমকা অফিসার রঙ্গলাল চক্রবর্তির ফোন আসায় নড়েচড়ে বসলাম। ভাবলাম বুঝি ভুবন অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু না, তার চেয়েও চাঞ্চল্যকর খবর এলো আমাদের কাছে। ছোটমামা রঙ্গলালবাবুর ফোনটা রিসিভ করে কানে দিয়েই চমকে উঠে বললো - "কি।। ঠিক আছে আমি আসছি।"

আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললো -"রেডি হয় নে। প্রকাশ স্যান্যালের বাড়ি যেতে হবে।"

-"এখন? কেন কি হয়েছে?"

-"একদিনে জোড়া খুন। প্রকাশবাবু ইজ ডেড।"

আমি কথা বলার মত কোনও ভাষা খুঁজে পেলাম না। রেডি হয় মামার পিছন পিছন স্যানট্রোতে উঠে বসলাম।

সন্ধ্যাবেলায় দেখা নিরিবিলি প্রকাশবাবুর বাড়ির সামনেও বন্দুকবাড়ির মত পুলিশের সমাবেশ। রঙ্গলালবাবুর সাথে আমরা সন্ধ্যাবেলার সেই ড্রয়িংরুমে পৌঁছলাম। সেখানে প্রকাশবাবুর মৃতদেহ স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন হচ্ছে। সাদা চাদর ওনার মুখের ওপর ঢাকা দেওয়ার আগে কিছুক্ষনের জন্য ওনার মুখটা দেখলাম। বিভৎস দেখাচ্ছে। চোখদুটো বিস্ফারিত। মাথার বামপাশটা রক্তাক্ত।মেঝেতেও কিছুটা রক্ত। শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

-"এনারেও মাথায় মারা হইসে। ওই ফুলদানি দিয়া। কি আশ্চর্য ব্যাপার কও তো। একদিনের মধ্যে দুইটা মানুষ মার্ডার। তাও আবার দুই কিলোমিটারের মধ্যে।" রঙ্গলালবাবু বললেন।

আমি দেখলাম পাশেই একটা ভাঙ্গা ফুলদানি। সন্ধ্যাবেলায় আলমারির পাশের টেবিলে রাখা ছিলো।

-"আপনাদের খবর কে দিলেন? বললো ছোটমামা।

-"এই পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক থানায় ফোন করসিলেন।"

-"তিনি কোথায়?"

-"হই তো বাইরে খারাইয়া আছেন"

ছোটমামা আর আমি রঙ্গলালবাবুর দেখিয়ে দেওয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির দিকে এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধের বয়স আশির কাছাকাছি। চোখে বাইফোকাল লেন্সের ভারী চশমা। ছোটমামা বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলো--" আপনিই পুলিশকে ডেকেছেন?"

-" হ্যাঁ বাবা।"

-"কিভাবে জানলেন যে এই বাড়িতে খুন হয়েছে?"

-"নয়টার সময় আমি আমার ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরছিলাম। এই রাস্তা দিয়ে। দেখি প্রকাশের ঘরের আলো জ্বলছে। তাই অবাক হয়েছিলাম। কেননা প্রকাশ প্রতিদিনিই রাত সাড়ে নয়টার পরে বাড়ি ফেরে। আমি যখন ঠিক এই বাড়ির সামনে, তখন আচমকা ঝড়ের মতো একটা লোক বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে পালালো। আমি ভাবলাম প্রকাশের বাড়ি চোর এসেছিল। কিন্তু প্রকাশের ঘরের খোলা দরজা দেখে ভিতরে এসে দেখি এই ব্যাপার।"

-"আপনাকে যে ধাক্কা দিয়েছে তার মুখ দেখতে পেয়েছেন?"

-"না বাবা। আমি বুড়ো মানুষ। চোখ খুবই দুর্বল। তাছাড়া রাতে ভালো দেখতেও পারিনা।"

-"আচ্ছা ঠিক আছে। একটা কথা বলুন তো, প্রকাশ স্যান্যাল কি বাড়িতে একাই থাকতেন।"

-"অর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তো একাই থাকত। তবে শুনেছিলাম অর নাকি একটা ভাই ছিল, মামার কাছে থাকত। এখানে কোনোদিন আসেনি। অনেকদিন আগে ছেড়ে চলে গেছে।"

-"আর কিছু জানেন?"

বৃদ্ধ খানিক ভেবে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন -"জানি না আমি ঠিক শুনেছি না ভুল। আজ দুপুরে আমার মনে হয় আমি প্রকাশের ঘর থেকে অন্য একজনের আওয়াজ পেয়েছি। কোনও কিছু নিয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল বোধয় প্রকাশের সাথে।"

-"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।" বৃদ্ধকে কথাটা বলে ছোটমামা আমাকে বললো-:অনি, তুই গাড়িতে গিয়ে বস আমার রঙ্গলালবাবুর সাথে একটু দরকার আছে।"
আমি তাই করলাম। পিছনে তখন রঙ্গলালবাবুকে মামা বলছে-" ভুবনের কোনও খবর পেলেন?"
উত্তর এলো -"না "
প্রায় আধঘন্টা পড় ছোটমামা ফিরে এলো সঙ্গে দুটি জিনিস নিয়ে। একটা ভাঁজ করা রেলওয়ে টিকিট অন্যটা একটা পুরনো ডায়েরি।
আমি বললাম -" এগুলো থেকে কি ক্লু পেলে নাকি?"
-"একটু আন্যালিসিস করতে হবে। তবে আরো একটা জিনিস পেয়েছি। সেটা চলে গেছে রঙ্গলালবাবুর কাছে।"
-"কি সেটা?"
-"চুরি যাওয়া ফ্লিন্টলকটা, তবে ভাঙ্গা অবস্থায়।"
-" সেকি, তাহলে কি প্রকাশবাবুই ওটা... কিন্তু.....ধুর.... সব গুলিয়ে যাচ্ছে।"
-"তোকে এত ভাবতে হবে না। বাড়ি ফিরে চুপচাপ ঘুমোবি।"

(৬)

প্রকাশবাবুর বাড়িতে পাওয়া ডায়েরিটা ছোটমামা আমাকে ছুঁতেও দেয়নি। একবার দেখতে চাওয়ায় ধমক খেলাম-" কারো পার্সোনাল ডায়েরি পড়তে নেই। জানিস না।"
-"তুমি পড়ছ যে?"
-" বেশী ওস্তাদি করিস না।"
তবে হ্যাঁ, টিকিটটা দেখতে দিয়েছে। আর সেটা দেখেই আমার চক্ষুস্থির। ভুবনেশ্বর টু হাওড়া রিজার্ভেশন করা। ইসু করা আছে B। SANYAL নামে।
আমি বললাম -"B। SANYAL মানে বিক্রম স্যান্যাল নয় তো? অ্যারাইভিং ডেটটাও কিন্তু মনমোহনবাবুর খুনের আগের দিনের"
ছোটমামা বললো -"একবার রেলওয়ে ইনকোয়ারীতে খবর নিতে হবে ভাবছি।
-" উফ আমি আর পারছি না। ভুবনের জুতো, স্যান্যালের টিকিট, ওই ডায়েরি, ভাঙ্গা ফ্লিনলক সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে"
-"জট ছাড়ানোর জন্য আমি আছি তো"
আমার একটা কথা মনে হওয়াতে ছোটমামাকে বেশ উৎসাহের সাথে বললাম -" আচ্ছা প্রকাশবাবু আর বিক্রমবাবু দুজনেই স্যান্যাল। তাহলে বিক্রমবাবুই প্রকাশবাবুর সেই পালিয়ে যাওয়া ভাই নয়তো?"
-"রাত সাড়ে বারোটা বাজে। তুই আমার মাথা খারাপ না করে চুপচাপ ঘুমিয়ে পর। আমি ডায়েরিটা একটু পড়ি।"
রাতে ঘুমের মধ্যে শুনলাম ও যেন কারোর সাথে কথা বলছে। সকালে জেগে দেখি মামা বাড়িতে নেই। পিসির কাছে শুনলাম সাতটায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে বলে যায়নি। সারা সকাল কাটিয়ে দুপুরে ফিরল ছোটমামা। আমি অবাক হয়ে বললাম -" কোথায় চলে গিয়েছিলে?"
-"একটা ব্যাপার একটু কনফার্ম করতে গিয়েছিলাম। টিভিতে খবর দেখেছিস কি?"
-" না তো। কেন কি হলো আবার?"
-" টিভি অন কর, বুঝে যাবি।"
যথারীতি টিভি চালিয়ে খবর দেখে নড়েচড়ে বসলাম। ভুবন ধরা পরেছে, দুটো খুন আর চুরির কথা শিকারও করেছে। এটাই হেডলাইনে দেখাচ্ছে।

-"তাহলে কেস কি এখানেই শেষ?" বেশ হতাশ ভাবে বললাম।

-"হুম, ইনভেস্টিগেসনের আর তেমন কিছু নেই। তবে একবার বন্দুকবাড়ি যেতে হবে।"

-"কেন?"

-"মনমোহন মজুমদারের শখের বন্দুকবাড়ির বন্দুক নিলাম হবে। দেখতে হবে কত দামে সেগুলো বিক্রি হয়। না হলে আবার প্রকাশ স্যান্যালের মতো যদি কম দামে সেগুলো অন্য লোকের কাছে যায় তাহলে খুব খারাপ লাগবে।"

-"কবে নিলামী হবে?"

-"বিক্রমবাবুর সাথে কথা হয়ে গেছে। উনি বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। কালকের মধ্যেই কোনো না কোনো খবর পাব আশা করছি।"

-"কিন্তু তোমার তদন্ত, এতদূর এগিয়ে এখন..............."

ছোটমামা হেসে আমার পিঠে আসতে একটা চাপড় মেরে বললো -" বেটার লাক নেক্সট টাইম অনি।"

(৭)

দুদিন পড় বন্দুকবাড়ির বৈঠকখানায় আমি আর মামা হাজির হলাম। বন্দুক নিলাম করার জন্য কাষ্টমার পাওয়া গেছে। পরমেন্দর সিংহ নামে এক শিখ ভদ্রলোক আগের দিন বিকেলে বন্দুর্বারিতে দেখা করে গেছেন। বিক্রমবাবু ছোটমামাকে খবরটা দিয়েছিল। তাই ছোটমামাও গিয়ে তার সাথে দেখা করে এসেছে।

ঠিক সকাল এগারটায় শিখ ভদ্রলোক এলেন বন্দুক বাড়িতে। বেশ ভালো চেহারা, মুখ ভর্তি দাড়ি আর পাকানো গোফ। কালো শুট-টাই-প্যান্ট আর মাথায় লাল পাগড়ি পরনে। চোখে সানগ্লাস। দেখে মনে হয় খুব ধনী ব্যক্তি। আমাদের তিনজনকে দেখেই বললেন -" নমস্তে"

আমরাও অভিবাদন জানালাম। ভদ্রলোক বললেন মজুমদারবাবুর গানের কালেকসন হামার বহুত আচ্ছা লেগেছে। ওনার মতো শৌখিন ইনসানের মার্ডার হলো সুনে বুরা লাগা।"

ছোটমামা সরাসরি নিলামের কথায় ফিরে এলো -" আপনি কি সব বন্দুকই নেবেন নাকি স্পেশাল কিছু?"

-" দেখুন মিস্টার। হামি রাইফেলের শখ রাখিনা। হামার সব পিস্তল অউর রিভলভারের কালেকশন। পিস্তল দেখালেই খুশি হবো।"

-" মাউজার, লুগার বা কোল্ট চলবে?" ছোটমামা হাতে একটা পেপারওয়েট নিয়ে পায়চারী সুরু করেছে।

সিংজি বললেন -" শুনেছি মজুমদারবাবুর একটা ফ্লিনলকের সেট আছে? দুটো পিস্তলের মধ্যে একটা চোরি ভি হয়ে গেছে?"

-" আপনার কি সেই সেটটা চাই?"

-"জরুর। ওটা পেলে ভালো হবে। হামায় একটা পিস্তল পেলেই চলবে।"

-"কিন্তু আপনাকে তো সেটটা দেওয়া যাবে না।"

-"কেন মিস্টার বর্মন? হামি কি দোষ করেছি?"

-"কোনো জিনিস কাউকে বিক্রি করার পড় তাকেই সেই জিনিস কিনতে তো কখনো শুনিনি।"

-"মতলব।।।। আপনি কি মিন করতে চাইছেন?"

-"এখুনি বুঝতে পারবেন মিস্টার সিং।"কথাটা বলেই ছোটমামা মুহূর্তের মধ্যে ওর হাতের পেপারওয়েটটা সজোরে সিংজির দিকে ছোরার ভঙ্গি করে বললো -"ক্যাচ ইট"

সিংজি সেকেন্ডের মধ্যে নিজের বাহাত দিয়ে মুখ আড়াল করতেই ওনার রিস্টওয়াচটা চোখে পড়ল। আমি সেটা চিনেই চমকে উঠলাম। এ তো সেই ঘড়ি, যা প্রকাশবাবুর হাতে দেখেছিলাম। তার মানে.........

-" এখনো কি নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন পরমেন্দর সিং? আপনার ছদ্মবেশ অনেক আগেই আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। আমার ফাঁদা জালে ভালমত জড়িয়েছেন। রঙ্গলালবাবু এদিকে আসুন।"

পাশ্বের ঘরেই একজন সাব-ইনস্পেক্টের আর দুজন কনস্টেবল কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বড়বাবু রঙ্গলালবাবু। ছোটমামা বললো -"বুদ্ধিটা বেশ ভালই করেছিলেন শেষ রক্ষা হলনা। এবার আপনার দাড়ি গোঁফ খুলে ফেললে ভালো হয়। নয়তো আমাকে আবার হাত মাগতে হবে।"

নিরুপায় হয়ে সিংজি নিজের দাড়ি গোফ খুললেন। এবার তাকে দেখে দ্বিতীয়বার বিস্মিত হলাম। দাড়িগোফের আড়ালে এতক্ষণ যিনি ছিলেন। তিনি হলেন প্রকাশ স্যান্যাল। আমার, বিক্রমবাবুর এমনকি রঙ্গলালবাবুর ও তার সঙ্গীদের চক্ষুস্থির। বিক্রামবাবু মুখ খুললেন -" আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রকাশ স্যান্যাল যদি মারা গিয়ে থাকেন ইনি কে?

ছোটমামা বললো -" সব বলছি। তার আগে বিক্রমবাবু আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আপনার দিদি এখন আগের থেকে অনেকটা সুস্থ আছেন।"

-" মানে? আমার দিদিকে আপনি দেখলেন কবে?"

-" যেদিন ভুবন ধরা পড়ল সেদিন সকালে আমি শান্তিপুর গেছিলাম। রিজার্ভেসন টিকিটের B. Sanyal আর বিক্রম স্যান্যাল এই ব্যক্তি নয় তা কনফার্ম করতে। সেদিন সকালে বাজার যাওয়ার পথে এই বাড়ির চাকর দেবুদার কাছে আপনার দিদির বাড়ির ঠিকানাটা নিই।"

তারপর আমাদের দিকে ঘুরে বললো -"শুনুন সকলে, আসল অপরাধী ভুবন নয়। ভুবন ভয়ে পেয়ে লুকিয়েছিলো। সেদিন রাতে ও গোপনে আমার কাছে এসেছিলো। আর আমিই ওকে ধরা দিতে বলি। যাতে আমি এই পরিকল্পনা করতে পারি। ভুবন যে এই কাজ করতে পারে না তা আমি তা প্রথমদিন থেকেই বুঝেছিলাম। কারণ, জুয়া খেলতে টাকা লাগে ফ্লিনলক পিস্তল নয়। ইনিই হলেন সমস্ত অপরাধের মধ্যমনি প্রকাশ স্যান্যাল।

রঙ্গলালবাবু বললেন -"তাহলে স্যান্যাল বাড়িতে খুন হইলো কেডা?"

-" B. Sanyal মানে বিকাশ সান্যাল। রেলওয়ে ইনকোয়ারি থেকে নামটা জেনেছি। প্রকাশবাবুর identical twin, হুবহু জমজ ভাই। কি তাই তো প্রকাশবাবু?

প্রকাশ স্যান্যাল মাথা নাড়লেন।

-"তাহলে স্যান্যালবাড়িতে ভুবনের জুতো...?" বললাম আমি।

-"একইরকম জুতো কি বিকাশ স্যান্যালের হতে পারেনা? তাছাড়া বিকাশবাবু খুনের পরেও ওই জুতো বাড়িতেই ছিলো। প্রকাশবাবুর বাড়িতে মৃতদেহের গলার কাছে একটা তিল ছিলো। যেটা প্রকাশবাবুর গলায় দেখিনি। আর প্রকাশবাবুর সর্বক্ষণের হাতঘরিও মৃতদেহের হাতে ছিলো না। তাই স্বাভাবিক ভাবে B. Sanyal বলতে বিক্রমবাবুর ওপরেই সন্দেহটা পড়ে। যেহেতু ওনার পদবিও স্যান্যাল। তাই বিক্রমবাবুর নিশ্চিত হয়ে আমি আমার সেই পুরনো ধারণাতেই ফিরে যাই। তারপর তো বাকি কাজ করেছেন প্রকাশবাবু নিজেই। কাল এখানে এসেই সর্দারজীর সেলাই করা বুট আর বাহাতের আস্তিনের নিচে ওই চেনয়ালা ঘড়ি লক্ষ্য করেছি। বাবার দেওয়া জিনিস প্রকাশবাবু ছদ্মবেশ নিয়েও ছাড়তে পারেননি। এবার প্রকাশবাবু বলবেন তিনি এই অপরাধ কেন করলেন। বলে ফেলুন প্রকাশবাবু।"

প্রকাশবাবু বললেন-"বিকাশের বদ স্বভাব আর নেশার অভ্যাস্যের জন্য বাবা ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। বন্দুকটা মনমোহনবাবুর কাছ থেকে ফিরে পাওয়ার জন্য ওকে ভুবনেশ্বর থেকে ডেকে এনেছিলাম। আমি জানতাম সহজ ভাবে মনমোহনবাবু ওটা ফেরত দেবেন না। তাই চুরিটা ওকে দিয়েই করাই। মনমোহনবাবু ওকে দেখে ফেলে ও খুন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এত টাকার নেশা ওর। সবই চাই ওর। দিয়েছি তাই শেষ করে।"

ছোটমামা বললো -"আপনার সাহস আছে মানতেই হবে। না হলে একটা পিস্তলে আসল জিনিস না পেয়ে আবার এসেছেন দ্বিতীয়টা নেওয়ার জন্য।"

রঙ্গলালবাবু বললেন -" আসল জিনিস আবার কিডা?"

প্রকাশবাবুর মামার মুখের দিকে তাকালো। মামা বিক্রমবাবুকে অন্য ফ্লিনলকটা আনতে বললো। ছোটমামা বললো - "আমি আপনার বাবার লেখা ডায়েরিটা পড়েছি প্রকাশবাবু।" ফ্লিনলকটা আনা হলো। মামা টান মারতেই ঠকঠক শব্দ করে টেবিলের ওপর কতগুলো জিনিস পরলো। আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে দেখলাম টেবিলের ওপর সূর্যের আলোতে ঝকঝক করছে পাঁচটা বড়ো বড়ো হিরে।

-" কিলপ্যাট্রিকের কোহিনুর। এই নামেই উল্লেখ করেছিলেন প্রকাশবাবুর বাবা। ওনার সারা জীবনের সঞ্চয় এই হিরেগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন এই পিস্তলের মধ্যে। কি ঠিক বলছি তো প্রকাশবাবু? ডায়েরিটা আপনিও পড়েছিলেন। তবে পিস্তল গুলো বিক্রি করার পর।"

প্রকাশ স্যান্যাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করলেন।

কবিতা

নববর্ষ উৎসব

মোঃ আঃ মুকতাদির

ভুলিয়ে দিতে অতীত গ্লানি
বৈশাখ এল আবার,
উৎসবের আনন্দ পেয়ে
নাচল মন সবার।
পান্তা ইলিশ আর মেলায় ঘুরে
দিনরাত হয় পার,
পার্থক্য নাই হিন্দু-মুসলিম
উৎসব এটি সবার।
আমাদের আছে বসন্ত
আছে আমাদের নবান্ন,
নববর্ষের মত আনন্দের
নাই কিছু অন্য।

বি শে ষ র চ না

ভারতের শার্লক হোমস্

- উজ্জ্বল দত্ত

(১)

এই কাহিনী কোনও গোয়েন্দা কাহিনী নয়। এখানে এমন একজন মানুষের জীবনের কথা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যা কিনা কোনও কাল্পনিক গোয়েন্দা গল্পের বা উপন্যাসের থেকে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। ইংরেজিতে বলা হয়-'Truth is stranger than fiction.' অর্থাৎ সত্য কল্পনার থেকে বেশি আশ্চর্যজনক। এই প্রবাদটি যে কতখানি সত্যি তা এই লেখাটি পড়লেই বোঝা যাবে।

মানুষের মধ্যে দেবতা ও দানব দুই-ই আছে। যে কোনও ধরণের সমাজ ব্যবস্থাই হোক না কেন এবং যে কোনও মানুষ গোষ্ঠী যতই সুশাসনে থাকুক না কেন, কিছু লোক সবসময় এমন থাকবেই যারা অন্যায় ও অপরাধ করবে। অন্যের উপর জুলুম করবে। অন্যের ন্যায্য সামাজিক অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। কবির কথায় বলা যায় – "কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর। মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।"

এই অপরাধী ও অন্যায়কারীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতেই সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন রকম আইন-কানুনের ও রক্ষীবাহিনীর বা পুলিশের, যারা বরাবরই সব দেশের প্রশাসনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে পুলিশ বাহিনীকে বরাবরই হেয় চোখে দেখা হয়। মাঝে মাঝে পুলিশের এমন সব ঘৃণিত, নির্মম ও অমানবিক কাজ কর্ম সামনে উঠে আসে যে চমকে উঠতে হয়। রক্ষকই অনেক সময় ভক্ষক হয়ে ওঠে।

তবে পুলিশ বাহিনীর পক্ষেও একটা কথা বলার আছে। পুলিশ যদি ভাল কাজও করে তবেও জনতার প্রশংসা তার ভাগ্যে তেমন জোটে না। আবার পান থেকে চুন খসলেই জনতা পুলিশের গায়ে "অকর্মণ্য" বলে ছাপ মেরে দেয়।

একটা কথা সবারই এখানে জানা উচিৎ যে পুলিশেরও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। বাঁধাধরা

নিয়মকানুন এবং নিজের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যেই পুলিশকে কাজ করতে হয়।

থানায় কোনও অপরাধের খবর এলেই, থানার চার্জে থাকা ইন্সপেক্টর বা সাব-ইন্সপেক্টরের তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে নিয়ম মাফিক পৌঁছনো প্রয়োজন। কিন্তু ওদিকে আবার নিয়ম হল যে থানা ছেরে যাবার আগে ঘটনাটা জেনারেল ডায়েরীতে নোট করতে হবে এবং সিনিয়র অফিসারকে ঘটনাটা জানাতে হবে। ঘটনাস্থলে যাবার জন্য জিপের এবং তাতে পেট্রল ভরবার জন্যও অনুমতি নিতে হবে। তারপর রাস্তায় চলতে গিয়ে পুলিশ পার্টি ট্রাফিক জ্যাম, লাল হলুদ সবুজ ট্রাফিক লাইট, রেলওয়ে ক্রসিং-এর বন্ধ গেইট ইত্যাদির বাঁধা কাটিয়ে যখন ঘটনা স্থলে পৌঁছাবে তখন জনতা কিছু না ভেবেই ধিক্কার দেবে। "আজকাল পুলিশ একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে গেছে। নয়তো আসতে এত সময় লাগে......"

এছাড়াও পুলিশকে খুনি গুন্ডা ডাকাত ও আতঙ্কবাদীদের মুখমুখি হতে হয় মান্ধাতার আমলের অস্ত্র -সস্ত্র নিয়ে, যার ফলে বহু অপরাধী পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষের পরেও পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পুলিশের কপালে আবার জোটে ছিছিক্কার। অনেক সময় রাজনৈতিক চাপেও অনেক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার পর ছেড়ে দিতে হয়। এসবই হল পুলিশের সীমাবদ্ধতা।

মানুষ কল্পনাশীল প্রাণী। পুলিশের এই সীমাবদ্ধতা ও অসফলতাকে ঢাকবার জন্য মানুষ কল্পনা করেছিল গোয়েন্দা গল্পের। গল্পের কাল্পনিক গোয়েন্দারা, অর্থাৎ শার্লক হোমস্ থেকে ফেলুদা পর্যন্ত প্রত্যেকেই আদর্শ চরিত্রের মানুষ। কোনোরকম মানবিক দুর্বলতা এনাদের মধ্যে নেই।

অপরাধ অনুসন্ধানের সময় এদের না জেনারেল ডায়েরি লিখতে হয় না উপরওয়ালার থেকে কথায় কথায় অনুমতি নিতে হয়। এরা প্রত্যেকেই সর্ব শক্তিমান। অপরাধীদের বুলেট এদের স্পর্শ করে না। অপরাধী যতই প্রবল শক্তিসম্পন্ন হোক না কেন, তার সব জারিজুরি ভেস্তে দিয়ে এরা অপরাধীকে পৌঁছে দেন বিচারকের সামনে।

তাই কাল্পনিক গল্পের গোয়েন্দারা মানুষের কাছ থেকে স্নেহ ও সন্মান পান, তা সত্যিকারের পুলিশবাহিনীর কপালে জোটে না। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অদ্ভুত ও মজাদার কিন্তু সত্যি।

(২)

তবুও ভারতীয় জনতা একজন পুলিশ অফিসারের কর্মদক্ষতায়, কার্যকুশলতায় ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তার নাম দিয়েছিল, "হায়দ্রাবাদের শার্লক হোমস্"।

১৯১৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত, হায়দ্রাবাদের পুলিশ বিভাগকে, বিশেষ করে তাদের গোয়েন্দা বিভাগকে তাদের কর্মদক্ষতা

ও কার্যকুশলতার জন্য আমজনতা প্রভুত প্রশংসা করত।

হায়দ্রাবাদ পুলিশে সে সময় সাধারণ কন্সটেবল থেকে উঁচুতলার অফিসাররা যথা "আমিন", "সদর আমিন" পর্যন্ত সবাই যোগ্যতার নিদর্শন রেখেছিলেনে।

এদের নাম শুনলেই বড় বড় অপরাধীদেরও হৃদকম্প শুরু হত। এদের মধ্যেও যিনি সব থেকে বেশী খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং যাকে জনতা নায়ক হিসাবে গণ্য করত, যিনি সব থেকে বেশী সম্মান ও পুরষ্কার লাভ করেছিলেন, যার সাহস কর্তব্যপরায়ণতা , পরিশ্রম , যোগ্যতা এবং চাতুর্য ছিল তুলনাহীন, তিনিই হলেন আমাদের কথানায়ক –স্বর্গত জনাব ফজল রসুল খান নাগর।

১৪৫১ সালে ভারতের তৎকালীন সম্রাট বেহলোল লোধির শাসনকালের সময় আফগানিস্থানের একদল আদিবাসী ভারতে আসে ও রাজস্থানে বসবাস শুরু করে।

এই গোষ্ঠীর যিনি নেতা ছিলেন তার নাম ছিল – ইয়ুনুস খান নাগর। নেতাকে সম্মান জানানোর জন্য কালক্রমে এই গোষ্ঠীর সব পুরুষরাই নামের শেষে "নাগর" শব্দাটি ব্যবহার করা শুরু করেন।

১৪৫৪ সালে এই গোষ্ঠী রাজস্থানের শেখাওটি, ক্ষেত্রে "নর্হর" নামক রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের পতন হয় ১৭৩২ সালে।

স্বাধীনতার সময় ১৯৪৭ সালে দেখা গেল যে রাজস্থানের তিনটে গ্রাম – ইসলামপুর, জইপাহারি ও ওয়াডানাতে এই "নাগর" বংশের কিছু পরিবার বসবাস করছে। অন্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ্য অনুসন্ধানে।

এইরকমই এক পরিবার ছিল মৌলবি আব্দুল নবি খানের পরিবার। তার তিন পুত্র। বড় ছেলের নাম মৌলবি ইব্রাহিম খান নাগর , মেজ ছেলের নাম ফজল রসুল খান নাগর - জিনি আমাদের কথানায়ক, ও ছোট ছেলের নাম মৌলবি হাবিব উর রহমান নাগর।

ফজল রসুল খান নাগরের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ সালে রাজস্থানের ইসলামপুর গ্রামে।

বড় ভাই ইব্রাহিম খান সাহিব প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর রাজস্থানের ইসলামপুর ছেড়ে হায়দ্রাবাদ চলে যান ও সেখানে পুলিশ বিভাগে চাকরি নেন।

বড় ভাই-এর দেখাদেখি ফজল রসুল খানও ১৯০৭ সালে হায়দ্রাবাদে চলে আসেন ও পুলিশের চাকরিতে যোগদান করেন। তার প্রথম নিযুক্তি হয় "বীড়" জেলাতে।

কিন্তু চাকরি করতে ভালো না লাগায় তিনি এক বছর পর চাকরি ছেড়ে রাজস্থান ফেরত চলে যান। এরপর তিনি আজমের-এর পুলিস বিভাগে যোগদান করেন ও ওখানের পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে হেড কন্সটেবলের পরীক্ষা পাস করেন।

ওদিকে ইব্রাহিম খান হায়দ্রাবাদ পুলিশে উন্নতি করতে করতে "সদর আমিন"-এর পোস্টে পৌঁছান। সে সময় হায়দ্রাবাদ পুলিশের প্রধান ছিলেন নবাব ইমাদ জং বাহাদুর। তিনি ইব্রাহিম খান সাহেবকে খুব সন্মান করতেন।

১৯১৫ সালে ইব্রাহিম খান সাহেব ভাই ফজল রসুল খানকে আবার হায়দ্রাবাদে ডেকে পাঠান ও নবাব ইমাদ জঙ বাহাদুরকে অনুরোধ করেন যে তার ভাইকে যেন আবার হায়দ্রাবাদ পুলিশে নিযুক্ত করা হয়।

নবাব ইমাদ জং বাহাদুর ওনার অনুরোধের সন্মান করে ফজল রসুল খানকে দার উল শফা আমিন কাছারিতে আমিনের পোস্টে নিযুক্ত করেন।

ব্যস্, এই সময় থেকে শুরু হয় তার বিচিত্র কর্মময় জীবন।

(৩)

ফজল রসুল খান ইংরেজী ও হায়দ্রাবাদের স্থানীয় তেলেগু ভাষা জানতেন না। তিনি উর্দু, ফরাসী, মারাঠী ও হিন্দি ভাষা জানতেন। কিন্তু তেলেগু ভাষা না জেনেও সেই তেলেগুভাষী রাজ্যে তিনি নিজের যোগ্যতা খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। খোদ হায়দ্রাবাদের নিজাম পর্যন্ত তার প্রশংসক হয়ে গেছিলেন।

নিজের ৩৬ বছরের দীর্ঘ হায়দ্রাবাদ পুলিশের কর্মজীবনে, অপরাধী দমনের জন্য হেন দুঃসাহসিকতার ও বুদ্ধিমত্তার কাজ নেই যা তিনি করেননি।

কর্মজীবনে একবার তার চোখের অসুখ হয়। ভুল করে চিকিৎসার সময় তার ডান চোখে ওষুধের বদলে অ্যাসিড পড়ে যায় এবং সেই চোখটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কর্মজীবনের অনেকটা সময়ে তাকে কাটাতে হয়েছে বাম চোখ সম্বল করে।

কি বিস্ময়কর ব্যাপার। আজকাল দুচোখ থাকতেও যেসব পুলিশ অফিসাররা অন্ধের মতো কাজকর্ম করে থাকেন তাদের ফজল সাহেবের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

এসব ঘটনা সত্ত্বেও দুঃসাহসিকতায় তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন তা মাত্র দুটো ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়।

২৪ মার্চ ১৯২০ সাল। ভয়ঙ্কর খুনি হাজী আব্দুল্লাহ বিলোচ, তলোয়ার দিয়ে দু ঘন্টার মধ্যে ৫ জনকে খুন করে ও ৬ জনকে আঘাত করে। এই ঘটনার কথা যখন ফজল সাহেবের কাছে এসে পৌঁছয়, তখন তিনি বাড়িতে বিশ্রাম করছিলেন।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা অবস্থায়, খালি হাতে ও খালি পায়ে সেই ভয়ঙ্কর খুনির পশ্চাদ্ধাবন করেন।

কয়েক মাইল এই ভাবে অনুসরণ করে ফজল সাহেব এই ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক খুনিকে গ্রেপ্তার করেন৷

এই খুনিকে অনুসরণ করবার সময় সে বেশ কয়েকবার ফজল সাহেবকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্তু ফজল সাহেব আশ্চর্য কৌশলে সেই খুনির সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তাকে বন্দী করেন৷

নিজাম এই ঘটনায় খুশী হয়ে ফজল সাহেবকে পুরস্কৃত করেন । সে সময় ফজল সাহেব হায়দ্রাবাদের মীর চৌক থানায় নিযুক্ত ছিলেন৷

১৭ মে ১৯৩১ এর দিন ফজল সাহেব আরেক ভয়াবহ অপরাধী শেখ মেহবুবের অনুসরণ করেন নিছক একলাই৷ একে ধরবার জন্য ফজল সাহেব ৩৫ ফুট উপর থেকে মুশা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন৷

এই অপরাধীকে কোর্টে নিয়ে যাবার সময় কোনোরকমে হাতকড়া খুলে ফেলে পালাচ্ছিল৷ পালাতে পালাতে অপরাধী মুশা নদিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে৷ কিন্তু ফজল সাহেবের হাত থেকে তার নিস্তার নেই৷ অবশেষে সে আবার গ্রেপ্তার হয়৷

এছাড়াও বুদ্ধির সূক্ষ্ম মার প্যাঁচে কত ভয়ঙ্কর অপরাধীকে যে তিনি কাবু করেছেন তার ইয়ত্তা নেই৷ তিনি যে কোনও থানাতে নিযুক্ত থাকুন না কেন, হায়দ্রাবাদে কোনও সঙ্গীন অপরাধ ঘটলে তাকে তদন্তের ভার দেওয়া হত৷

(৪)

আজকাল আমরা কত সময় দেখি যে পুলিশ আপারাধীকে গ্রেপ্তার করলেও অপরাধী কোর্টে ছাড়া পেয়ে যায় । কেননা পুলিশ ভাল করে তদন্ত করে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে কেস সাজাতে পারেনা । তাই সন্দেহের অবকাশে অনেক ঘৃণ্য অপরাধের অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায় ।

শুনতে অদ্ভুত ও আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি যে ফজল সাহেব নিজের ৩৬ বছরের কর্মজীবনে যে অসংখ্য অপরাধের তদন্ত করেছিলেন তার মধ্যে মাত্র দুটো কেসে তিনি অসফল হয়েছিলেন৷ হ্যাঁ, মাত্র দুটো কেসে তিনি অপরাধীকে সাজা দেওয়াতে পারেননি৷ এরকম বিস্ময়কর ছিল তার কার্যকুশলতা৷

পুলিশ বিজ্ঞানে আগ্রহী গবেষকরা যদি ফজল সাহেবের জীবন ও কর্ম পদ্ধতির উপর গবেষণা করেন তবে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হবে যে এটি একটি বিশ্বরেকর্ড৷

ফজল সাহেবের দুটো অসফল কেসের মধ্যে একটায় আবার প্রচুর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়েছিল৷ এটা ছিল বিখ্যাত "শইবুল্লাহ্ মার্ডার কেস"৷

শইবুল্লাহ্ খান ছিলেন হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ইমরোজের সম্পাদক৷ ১৯৪৮ সালের ২১-২২ অগাস্টের মধ্য রাত্রে তাকে খুন করা হয়৷

হত্যাকারী ছিল তৎকালীন মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলমীনের সদর এবং রাজাকারদের নেতা কাসিম রিজভি। শইবুল্লাহ্, কাসিম রিজভির নীতির বিরোধী ছিলেন, তাই এই হত্যাকান্ড।

এই কেসে তৎকালীন হায়দ্রাবাদের বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা হস্তক্ষেপ করেন। এর ফলে ফজল সাহেব অসফল হন।

(৫)

ফজল সাহেব নিজের কর্মজীবনে বহুবার নগদ অর্থ, মেডেল ও প্রশংসাপত্র পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন। নিজের অধীনস্থ কর্মচারীদের ফজল সাহেব খুব স্নেহ করতেন । তাই নগদ অর্থ পুরস্কার পেলে তা সব সময় তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন । তিনি যে সমস্ত পুরস্কার পেয়েছিলেন তার মধ্যে প্রধান দুটো পুরস্কারের বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

৩০ নভেম্বর ১৯৩৭ সালে হায়দ্রাবাদে নিজাম তাকে গ্যালান্ট্রি মেডেল দেন।তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম পুলিশ অফিসার যিনি নিজামের হাত থেকে এই মেডেল পান। এর বেশ কয়েক বছর পর যখন "নিজামস্ পুলিশ মেডেল" –এর প্রচলন শুরু হয় তখন ফজল সাহেবের মেডেলকেও এর সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় এবং তাকে আজীবন ঐ মেডেলের স্বীকৃতি স্বরূপ মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়।

ফজল সাহেবের স্বর্গ লাভের পর তার বিধবা স্ত্রীকেও এই বৃত্তি আজীবন প্রদান করা হয়েছিল।

সে সময়ের বিখ্যাত জালিয়াত ছিল লখনৌ এর ইমদাদ খান। এই ইমদাদ খান নোট ও মুদ্রা জাল করত। ইমদাদ খানের যোগ্য শিষ্য ও ডান হাত ছিল আব্দুল রশিদ। এই আব্দুল রশিদকে ফজল সাহেব প্রভুত চেষ্টার পর হাতেনাতে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন।

এর পুরস্কার স্বরূপ সরকার থেকে তাকে একটা মাউসার রিভলভার প্রদান করা হয়।

(৬)

ফজল সাহেবের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে তিনি মানুষের মুখ দেখে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝতে পারতেন। এই ব্যাপারে তার ক্ষমতা ছিল প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ের। তিনি তার অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রায়ই বলতেন –"ইতমাদ (বিশ্বাস) সে ইতমাদ পয়দা হোতা হ্যায় "।

একবার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ এক অপরাধীকে কয়েকদিনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় এবং তাকে ফজল সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হয়।

খুব অদ্ভুত ভাবে ওই অপরাধীটি ফজল সাহেবকে বলে যে তার পরিবার বর্তমানে কিছু বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়েছে। তাই ফজল সাহেব যদি তাকে ছেড়ে দেন তবে তিনি তাকে যখনই ডাকবেন সে এসে হাজির হবে।

এই ধরনের অযৌক্তিক আবদার শুনে অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা তাকে এই মারে তো সেই

মারে। কিন্তু আরো অদ্ভুত ব্যাপার হল যে ফজল সাহেব সেই অপরাধীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, সমস্ত নিয়মের বিপরীত তাকে ছেড়ে দেন।

সমস্ত পুলিশ কর্মচারীরা ওনার এহেন আচরণে অবাক হয়ে যায়। সবাই সন্দেহ প্রকাশ করে যে ওই অপরাধী পালিয়েছে। ওকে আর ধরা যাবে না এবং এর জন্য ফজল সাহেবকে উপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু আরো অদ্ভুত ব্যাপার তাদের দেখতে বাকি ছিল। যখন এই কেসের মোকদ্দমা কোর্টে উঠলো তখন ফজল সাহেব একটা চিঠি লিখে ওই অপরাধীকে আসতে বললেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় যে ওই অপরাধী ফজল সাহেবের চিঠি পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে তার কাছে হাজির হল।

শেখ আহমেদ ছিল সে সময়ের বিখ্যাত চোর ও ছিন্তাইবাজ। ফজল সাহেব তাকে গ্রেপ্তার করেন ও তার জেল হয়। ফজল সাহেব মাঝে মাঝে এই শেখ আহমেদকে জেল থেকে আনিয়ে স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করার জন্য ছেড়ে দিতেন এবং শেখ আহমেদ ফজল সাহেবের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করত ও তাকে অপরাধ জগতের তাজা খবরাখবর জোগাড় করে দিত।

একজন পুলিশ অফিসার ও একজন অপরাধীর মধ্যে এই সহযোগিতা ও বিশ্বাসের উদাহরণ বোধহয় খুব বেশি নেই।

(৭)

মানব চরিত্র ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ফজল সাহেবের জ্ঞান যে কত গভীর ছিল এই ঘটনাগুলোই তার প্রমাণ এবং এর ফলেই তিনি কর্মজীবনে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন।

ফজল সাহেবের সুপুত্র জনাব মুরতুজা আলী নাগর সাহেব অন্ধ্রপ্রদেশেই থাকেন। তিনি সাব জজ হয়ে রিটায়ার করেন। তিনি উর্দুতে একটি বই লিখেছেন। বইয়ের নাম “সুরাগরাসানি অর তাফিতশ"। এই বইয়ে ফজল সাহেবের প্রামাণ্য জীবনী ও ওনার সমাধান করা বিভিন্ন সব অদ্ভুত কেসের বিবরণ আছে।

মুরতুজা সাহেব লিখেছেন ওনার পিতা লম্বা দাড়ি ও গোঁফ রাখতেন। ছদ্মবেশ ধারণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ওই গোঁফ দাড়ি র জন্য মাথায় পাগড়ি বাঁধলে ও হাতে কড়া পরলে কারুর সাধ্য ছিল না যে বোঝে যে তিনি শিখ নন।

নিজের কাজকে তিনি এতই ভালবাসতেন যে দিন রাত থানাতেই পরে থাকতেন। কত কত দিন হয়ে যেত যে তিনি নিজের স্ত্রী পুত্রকে দেখবার জন্যও বাড়িতে আসতে পারতেন না।

যখন দু চার ঘন্টার জন্য বাড়িতে আসতেন তখনও প্রায়ই ছদ্মবেশে আসতেন যাতে কিনা অপরাধীরা তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ি খুঁজে বার না করতে পারে। কেননা তাতে তার স্ত্রী ও পুত্রের বিপদের আশঙ্কা ছিল।

আবার সেই ছদ্মবেশও বা কত রকমেরই না হত। কখনো শিখ, কখনো ভিখারী, কখনো মৌলবী, কখনো সাধু, কখনো ফকির আবার কখনো বা ফেরিওয়ালা।

(৮)

১৫ মে ১৯৬৫ সালে সর্ব প্রথম ফজল সাহেবের সমাধান করা কিছু জটিল কেসের বিবরণ লন্ডন থেকে প্রকাশিত "উর্দু টাইমস বৃটানিয়া"তে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনটির শীর্ষক ছিল, "হায়দ্রাবাদ , ডেকান, এর শার্লক হোমস"

তারপর ওনার সম্বন্ধে পাকিস্তানের সংবাদ পত্র "জঙ" এবং ভারতের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা – দ্য সানডে স্ট্যান্ডার্ড, দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া, টাইমস অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদিতে ছাপা হয়।

এই সমস্ত পত্র পত্রিকাতেও তাকে সবসময় ভারতের শার্লক হোমস নামেই সম্বোধন করা হয়।

দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পরে ফজল সাহেব ১৯৫১ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ হায়দ্রাবাদ পুলিশ (সি আই ডি)এর পোস্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে এই মহাবীর পুরুষ ও কর্মযোগী স্বর্গ লাভ করেন।

খুব মজার কথা হলো এই যে কাল্পনিক শার্লক হোমসের উপর ভারতীয় গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক পাঠক,পুলিশ বিজ্ঞানের গবেষক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা যত চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং মাথা ঘামিয়েছেন তার দশ ভাগের এক ভাগও যদি এই সত্যি শার্লক হোমসের উপর গবেষণার কাজে লাগাতেন তাহলে বিশ্বের দরবারে অপরাধ বিজ্ঞান ও অপরাধ সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের মাথা যে অনেক উঁচুতে উঠে যেত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি। ওনার কর্ম সম্পর্কিত কাগজ পত্র এখনও হয়ত হায়দ্রাবাদ পুলিশের মহাফেজখানা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

এই বিষয়ের গবেষকদের উচিত, এই সত্যি ভারতীয় শার্লক হোমসের উপর বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করে তা জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত করা।

কেননা ওনার কর্মময় জীবন আমাদের সবাইকে আজীবন অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা যোগায়।

১০০ নং গড়পার রোড : ২

চিত্রগ্রাহক : চিরঞ্জিত দাস

গল্প

খুনি

- সন্দীপ দাস

মুসৌরি--"কুইন অফ দা হিলস"। শীতের সকালে শুনশান পাহাড়ের সাথে একা আমি,এক নিবিড় প্রণয়ের সম্পর্কে আমরা যেন আবদ্ধ,এখন আমাদের অভিসারের পালা। ঘড়ির কাটায় সময় বলছে ছটা কুড়ি। আমাদের কলকাতা হলে এতক্ষণে শহরের পার্কগুলোতে প্রাতঃভ্রমণকারীদের ভিড় লেগে গেছে,কেউ একপ্রান্তে যোগাসন করছে তো কেউ আবার তার পোষ্য সারমেয়টাকে নিয়ে হাঁটতে বেড়িয়েছে। ঘুম ভেজা চোখ নিয়ে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে গুলো স্কুল বাসের অপেক্ষা করছে, কেউ বা আবার নাইট শিফট শেষ করে বাড়ি ফিরছে--এসব দৃশ্যের সাথেই আমি পরিচিত। তবে এখানে এসে এক নতুন সকালের সাথে পরিচয় হল নিস্তব্ধ,নিঃঝুম। সূর্যদেব এখনো এখানে তার রক্তিম বর্ণ ধারণ করে উঠতে পারেননি, কোন চা দোকানের ঝাপ ও এখনো খোলেনি। রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণকারীর সংখ্যাটাও আমাকে ছাড়া শূন্য। খাদের ধারে রেলিং এর পাশে এসে দাঁড়ালে দিগন্ত বিস্তৃত যে পাহাড়গুলো চোখে পড়ছে তাদের দেখে মনে হতে বাধ্য যেন কেউ কালো মেঘের চাদর দিয়ে ওদের ডেকে দিয়েছে। কাল রাতে এখান থেকে দূরের দেরাদুন শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন কৃত্রিম ক্ষমতাবলে এক বিশাল আয়না গড়ে আকাশের এক হুবহু প্রতিবিম্ব আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে,যার মধ্যে ধ্রুবতারা সম আলোকোজ্জ্বল অসংখ্য আলোকরাশি চোখে পড়ছিল। এই ভোরে তারাও যেন নিদ্রা গেছে।

দিনসাতেক হল আমি মুসৌরিতে এসেছি আর পরবর্তী বছর দুয়েক খুব সম্ভবত আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আমি পেশায় একটি সরকারি ব্যাঙ্কের কর্মচারী,কর্মসূত্রেই আমার এখানে আসা। এর আগে ছিলাম ছত্তিসগড়ের কুঙ্কুরিতে। কুঙ্কুরির কথা আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই জানেনা,কিন্তু কুঙ্কুরির "Our Lady of the Rosary"চার্চ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম। মুসৌরিতে ও একটি চার্চ আছে, "সেন্ট মেরি" যা হিমালয়ের সবচেয়ে প্রাচীন চার্চ বলে আমি শুনেছি। এইমুহূর্তে আমি সেই চার্চের পাশ

দিয়ে হেঁটে চলেছি,নানা রঙের আলো দিয়ে চার্চটাকে সাজানো হয়েছে,আলোগুলো কখন জ্বলছে কখন নিভছে যেন এই আঁধারে নিঃসঙ্গ আমাকে তার উপস্থিতির জানান দিচ্ছে।

এখানে আসার পর থেকে মুসৌরির দর্শনীয়স্থানগুলো ঘুরে দেখার ইচ্ছে থাকলেও দেখা হয়ে ওঠেনি,নিজের নতুন কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পরেছিলাম। আজ রবিবার,ছুটির দিন তাই আজই শহরটাকে ঘুরে দেখতে বেড়িয়ে পড়েছি। আমার এখনকার গন্তব্য গান হিল পয়েন্ট যা মুসৌরির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। মাল রোড থেকে রোপওয়ে করে মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে,আবার পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্যেও রাস্তা আছে। আমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলাম। এই পথে বাঁদরের খুব উপদ্রব তাই ক্যামেরাটা সাথে আনিনি। মাল রোড থেকে পায়ে হাঁটার পথ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে একটি ফলকে লেখা 'গান হিল পয়েন্ট-৪০০ মিটার, ১০ মিনিট'। সময়টা যে সমতলের মানুষের কথা ভেবে লেখা হয়নি সেটা বলে দিতে হয়না। আমি সেই পথ বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

সুসজ্জিত মাল রোডের সাথে এই পথের বেশ অমিল। সংকীর্ণ,জীর্ণপ্রায় পথ,ভীষণ চড়াই একটু ওঠার সাথে সাথেই পথ বাঁক নিচ্ছে বারেবারে। মাল রোডের মত খাদের ধারে রেলিং ও নেই। আকাশের রঙ এখন সিঁদুরে লাল। মিনিট পাঁচেকের বেশী একটানা চড়াই বেয়ে উঠতে পারছিনা,শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে,নাকের কাছে একটা জ্বালা অনুভব করছি,পায়ের পাতাগুলো অসম্ভব ভারি মনে হচ্ছে। মুসৌরি আসার আগে আমার এক বাল্যবন্ধু নিলাদ্রি একটা পরামর্শ দিয়েছিল আমি যেন চড়াই ভেঙ্গে ওঠার সময় মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস না নি,সেই উপদেশ পালন করার তীব্র ইচ্ছে থাকলেও শেষ রক্ষা করতে পারলামনা,একটা বিশাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শরীরটাকে একটি ডিম্বাকার পাথরের চাইয়ের উপর হেলিয়ে দিলাম। মিনিট তিনেক ওখানেই বসে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দুচোখ দিয়ে যতটা সম্ভব লুণ্ঠন করে নিলাম। এক অচেনা ফুল ফুটে রয়েছে খাদের ধারে,তার লাল রঙ দেখে মনে হয় যেন কারো রক্তে সে সবেমাত্র স্নাত হয়েছে।

এরপর আবার হাঁটা শুরু। আরো প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর পাহাড়চূড়ার দুর্গা মন্দিরটা আমার নজরে এল। গান হিল পয়েন্টের এই দুর্গা মন্দিরের কথা আমি ভ্রমণের বইতে পড়েছি। ব্রিটিশ আমলে এইখান থেকেই মধ্যাহ্নের সময় এক রাউন্ড গুলি শূন্যে ফায়ার করা হত,যার ফলে সকলে সময় সম্পর্কে অবহিত হতে পারতো তাই এই চূড়ার নাম হয় গান হিল পয়েন্ট। মিনিট চল্লিশের পরিশ্রম অবশেষে সফল হল,এক অদৃশ্য হাত দিয়ে নিজের পিঠটা বার দুয়েক চাপড়ে দিলাম। একরাশ হাসি মুখে নিয়ে শেষটুকু চড়তে যেই না পা বাড়াতে গেছি ঠিক সেই সময় এক অচেনা কণ্ঠস্বর আমার কানে এল।

"ওয়েল ডান মি. ঘোষ, এবার দেরী না করে জলদি বাকিটা চড়ে ফেলুন সেই কখন থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। "বরফ শীতল গলায় সে বলল।

হতবাক হয়ে পড়লাম আমি,চতুর্দিকেতাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না। এই নতুন প্রদেশে আমার চেনা কোন বাঙ্গালি মিত্র নেই,তবে কে আমার পদবি ধরে এতো মিষ্টি করে আমায় ডাকল?

"ওখানেই দাঁড়িয়ে পরলেন কেন?আর একটু উপরে উঠে আসুন,তারপর নিজের বামদিকে তাকালেই আমায় দেখতে পারবেন। "সেই একই রকম শান্তস্বরে অদৃশ্য মানুষটা বলল।

আর অপেক্ষা না করে দ্রুত পা চালিয়ে উপরে উঠে আসলাম। তারপর সেই অচেনা কণ্ঠস্বরের কথা মত বামদিকে তাকাতেই আমার সারা শরীর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা তড়িতের স্রোত বয়ে গেল। এক ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এক অচেনা ভদ্রলোক খাদের ধারে বসে রয়েছেন,তার একটা হাত খাদের দিকে বাড়ানো, সেই বাড়ানো হাতের শেষ প্রান্তটা ধরে এক মহিলা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন খাদ থেকে উঠে আসার। কিন্তু সেই ভদ্রলোক এই প্রচেষ্টায় তাকে কোন সাহায্য করছেননাবরং তাকে খাদের অতলে তলিয়ে যেতে দেখলেই যেন তিনি বেশী খুশি হবেন। মহিলার মুখে কালো মুখোস পরানো রয়েছে তাই তাকে আমি চিনি কিনা তা বুঝতে পারলামনা,খুব সম্ভবত তার মুখটাও বাঁধা আছে নাহলে এইরূপ অবস্থায় কেউ আর্তনাদ না করে থাকতে পারেনা। অচেনা ব্যক্তিটির মাথায় কালো টুপি,নাক-কান মাফলাড় দিয়ে মোড়া,চোখে কালো সানগ্লাস ফলে এই ব্যক্তিটিকেও চেনার কোন সুযোগ আমার কাছে নেই। ঠিক কি সূত্রে এই ব্যক্তি আমার সঙ্গে পরিচিত তা উপলব্ধি করতে পারলামনা। আমার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে পড়ছে,বাকশক্তিও যেন লোপ পাচ্ছে।

অনেক কষ্ট করে তাও বললাম,"ওনাকে টেনে তুলছেন না কেন?আমি কি আপনাকে সাহায্য করব?"

"সাহায্য তো আপনাকে করতেই হবে মি.ঘোষ ওনাকে উপরে তোলার জন্যে,তবে এই উপরে নয় ঐ উপরে। "কথাটা বলতে বলতে ভদ্রলোক আকাশের দিকে তাকালেন।

কি সর্বনাশ কাণ্ড!উনি তারমানে এই মহিলাকে চিরতরে উপরে পাঠাতে চান,কথাটা ভাবামাত্র আমার শরীরের অবশিষ্ট বলওনিঃশেষ হয়ে গেল।

"কি ভাবতে বসলেন আবার?আসুন জলদি,এই মেয়েটাকে আমাদের খতম করতে হবে। আর বেশী সময় নেই হাতে,একটু পরেই লোকজন এখানে ভিড় করতে শুরু করবে,ন'টার সময় রোপওয়ে চালু হয়ে যাবে। "ঐ লোকটা বলল।

"আমি কেন এমন এক অপরাধমূলক কাজে আপনাকে সাহায্য করব?আপনি টেনে তুলুন মেয়েটাকে। "আমি ভারিকণ্ঠে বললাম।

"কেন রসিকতা করছেন মি. ঘোষ?আপনিই তো কাল আমায় বললেন মেয়েটার থেকে মুক্তি পেতে হলে আমায় ওকে সোজা উপরে পাঠিয়ে দিতে হবে,এখন আমি তো শুধু আপনার কথামতো কাজ করছি।"

"কি যাতা বলছেন?আমি আজকের আগে আপনাকে কখনো দেখিনি আর এমন অসৎ উপদেশ আমি কাউকে দিইনা।"

"হ্যাঁ এটা ঠিক,আপনি উপদেশ বেশী দেননা বরং সরাসরি মানুষকে উ-প-রে উঠিয়ে দেন,আপনি জাত খুনি এটা জানতাম তবে আপনি যে জাত অভিনেতা সেটা আজ জানলাম। হাহাহাহাহাহা…………………."

"আমি খুনি নই। "চিৎকার করে আমি বললাম।

"এ কি কথা বলছেন মি. ঘোষ,প্রায় প্রতি মাসে আপনি নিজের হাতে খানদুয়েক খুন করে থাকেন আর আপনি বলছেন আপনি খুনি নন,ভেরি ফানি।"

"আপনি অন্যকারোর সাথে আমাকে বোধহয় গুলিয়ে ফেলেছেন,আমি……………"

"আপনি কল্লোল ঘোষ নন বুঝি?কলকাতার পাইকপাড়ায় আপনার আদি বাড়ি নেই?"

"এসব আপনি কি করে জানলেন?"

"আপনিই তো কাল বললেন আমায়… ,যাইহোক ওসব ছাড়ুন এবার এই মেয়েটার খুনে আমায় সাহায্য করুন,বেচারা কখন থেকে জীবন আর মৃত্যুর মাঝে ঝুলে রয়েছে আসুন একে পরমগতি প্রাপ্ত করানো যাক।"

"ওকে খুন করার হলে আপনি করুন, আমি খুনি নই…….."

"আবার এক কথা!বলছিনা আপনি সাহায্য না করলে আমি ওকে মারতে পারবনা। আর নিজেকে খুনি না ভাবলেই কোন খুনি চট করে নির্দোষ হয়ে যায়না মি.ঘোষ। আপনি খুনি ছিলেন, খুনি আছেন আর খুনিই থাকবেন। হাহাহাহাহাহাহাহা…………."

"আমি খুনি নইইইইইই……………………….। "চিলচিৎকার করে আমি বললাম।

আমার গলার স্বর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল,পাশের এক গাছে বসে থাকা দুটো অচেনা পাখি দ্রুত ডানা জাপটে বার দুই ডেকে ওখান থেকে উড়ে গেল অন্যত্র—আর ঠিক তখনই আমার চোখ খুলল।

এতক্ষণ ধরে আমি স্বপ্নের দেশে ছিলাম আর এখন ব্যাঙ্ক থেকে আমায় যে ঘর দেওয়া হয়েছে আমি সেই ঘরের ভিতর একটা চেয়ারে বসে আছি,সামনের টেবিলের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাগজ পরে আছে যাকে খসড়া বলা চলে, টেবিলল্যাম্পের আলোয় সেই কাগজের উপরের লেখাগুলো জ্বলজ্বল করছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি যে বাস্তব নয় তা ভেবে মনে মনে অনেক শান্তি পেলাম। বাইরে এখনো অন্ধকার কাটেনি কিন্তু আমার মনের অন্ধকার কেটে গেছে। আমার দ্বিতীয় পরিচয়টার কথা এতক্ষণ বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম আমি একজন শখের লেখক মূলত রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের জন্যে লিখে থাকি। কাল রাতে একটু বেশী নেশা করে ফেলেছিলাম,তবে তার আগে একটা গল্প লিখতে শুরু করেছিলাম-পরকিয়া গল্প।

গল্পের দুটো মুখ্য চরিত্র-আলতাজ খান আর ঝিলাম রাওয়াত। আলতাজ কাশ্মীরের বাসিন্দা,কিন্তু ব্যবসার খাতিরে মুসৌরিতে থাকে এখানে ওর শালের দোকান,এর আগে ও কলকাতায় বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে শাল বিক্রি করত তাই বাংলা ভাষায় ও খুব সাবলীল হয়ে উঠেছিল। ওর স্ত্রী থাকে কাশ্মীরে। ঝিলাম এই পাহাড়েরই মেয়ে,ওর বাবা একজন ট্যাক্সিচালক। ঘটনাচক্রে আলতাজের সঙ্গে ওর পরিচয় হয় আর তারপর ধীরেধীরে সেই সম্পর্ক প্রেমে পর্যবশিত হয়। আলতাজ ওর কাছে নিজের স্ত্রীর কথা গোপন করেনি কিন্তু একথা জানার পরও ঝিলাম আলতাজকে ভালবেসে গেছে। প্রেম বড়ই অবুঝ। আলতাজও ঝিলামকে ভীষণ ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছিল। ওর বিয়েটা হয়েছিল আব্বাজানের ইচ্ছায়,কিন্তু কোনোদিনই ও ওর স্ত্রীকে ভালবেসে উঠতে পারেনি। সেদিক দিয়ে ঝিলামই ওর জীবনের প্রথম প্রেম। ওদের প্রেমকাহিনী বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ তাতে এক নতুন মোড় এল। আলতাজের বাড়ি থেকে খবর এল যে তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা অর্থাৎ আলতাজ বাবা হতে চলেছে। এই এক ঘটনায় তার মোহচ্যুতি হল,সে ঝিলামের সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইল। কিন্তু ঝিলাম এটা মেনে নিতে পারল না,আলতাজকে হুমকি দিল সে—সম্পর্ক ত্যাগ করলে সে সবাইকে বলবে আলতাজ তার সাথে অসভ্যতা করার চেষ্টা করেছে। পাহাড়ি মানুষ একতায় বিশ্বাস করে এমন খবর চাউর হলে তার ব্যবসা যে তারা লাটে উঠিয়ে দেবে তা বুঝতে আলতাজের দেরী হলনা। সে ঠিক করল ঝিলামকে শুধু তার জীবন থেকেই নয় পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। সে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে থাকল আর ঝিলামের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখল। এরপর একদিন সে ভোরের সূর্য দেখানোর কথা বলে ঝিলামকে নিয়ে চলে গেল গান-হিল পয়েন্টে আর মনে মনে ওর মৃত্যুর পরিকল্পনা করে ফেলল- হিল পয়েন্টের চূড়া থেকে ঝিলামকে সে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।

এইপর্যন্ত গল্পটা আমার লেখা হয়েছে। এরপর কি হবে তা এখনো লেখা বাকি। অন্য একটা পাতায় গল্পের সম্ভাব্য কয়েকটা পরিণতি আমি প্রশ্ন আকারে লিখে রেখেছি।

আলতাজ কি পারবে ঝিলামকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে? পারবে কি তার ভালোবাসার খুন করতে?নাকি ভোরের সূর্যের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে ঝিলামকে নিয়ে এক নতুন জীবন শুরু করার শপথ নেবে?

আলতাজ আমার স্বপ্নে তাই আমার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করছিল,আমার সাহায্য ছাড়া সত্যিই ও নিরুপায় ওর একার পক্ষে ঝিলামকে খুন করা সম্ভব নয়। আগে কখনো উপলব্ধি করিনি তবে আজ করলাম,আমি পেশায় খুনিও বটে। প্রতিমাসে নিয়ম করে দুটো রহস্য গল্প আমি লিখি আর তাতে দুটো খুনও করি খুব সহজেই। বন্দুকের গুলি কিংবা ছুরির আঘাতে অনেক সময় মানুষ মরেনা কিন্তু আমার পেনের ছোঁওয়ায় যেকোনো সময় আমি যেকোনো কাউকে খুন করতে পারি। সত্য আলতাজ তুমি সত্য আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ খুনি। আলতাজ ঠিকই বলেছে আমার হাতেই মেয়েটার জীবন, আমার কলম ঠিক করবে ঝিলাম বাঁচবে না খাদের অতলে তলিয়ে যাবে। ধন্যবাদ আলতাজ আমাকে আমার নিজের সাথে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে।

টেবিলের উপর থেকে কলমটা উঠিয়ে নিলাম যেটাকে আর শুধু কলম বলা যায়না মারণাস্ত্রও বটে। অন্য সময় হলে ঝিলামকে হয়তো আমি বাঁচতে দিতাম কিন্তু এখন আমার শরীরে খুনির রক্ত বইছে,ঝিলাম আমায় মাফ কোরো আমাকে তোমায় মারতেই হবে---আমি যে খুনি।

ধাঁধাঁ
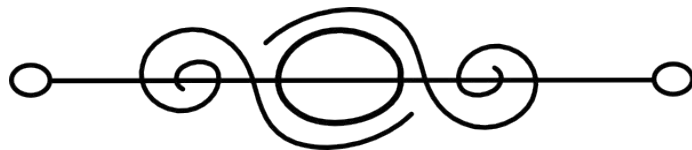
- সৌভিক ভট্টাচার্য্য

১. পৃথিবীতে মোট কটা দেশ?

২. একটা দশ হাত লম্বা কালীর মূর্তি মন্দিরে ঢোকাতে পনের হাত লম্বা আর তিন হাত চওড়া দরজার দরকার হয়, তবে একটা চার হাত কালীকে কিভাবে একহাত লম্বার একহাত চওড়া জানলা দিয়ে ভিতরে ঢোকানো যাবে?

৩. বাবা, মা, ছেলের মেয়ে নৌকা বয়ে নদী পার হবেন। সঙ্গে আছে ধুমসো কুকুর ভুলো। সে কিছুতেই সাঁতরে পার হবে না। অবশ্য ওরা চার জনেই নৌকা বওয়ায় ওস্তাদ। কিন্তু মুস্কিল হলো কি, নৌকায় এক সঙ্গে ৭০ কেজির বেশি ওজোন নেওয়া যাবেনা। বাবা এবং মা এক এক জনেই তো ৭০ কেজি। ছেলের ওজোন ৪০ আর মায়ের ৩০ কেজি। এমনকি ভুলোর ওজোনও ১৫ কেজির কম হবে না। সে আবার বড় অদূরে কুকুর। কোনো

সময়েই তাকে একা এপার বা ওপারে রাখা যাবে না। বল দেখি সবচেয়ে সহজে ওরা সবাই ওপারে যেতে পারবেন ??? (১৩৮৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার সন্দেশে বেরিয়াছিল)

৪. চাঁদ থেকে পৃথিবীর দিকে তাক করে তুমি একটা ঢিল ছুঁড়লে। ঢিলটা কোথায় এসে পরবে।

৫. একটা হোটেলে ম্যানেজার পদের লোকের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল। একটা ছেলে ইন্টারভিউ দিতে গেছে। যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি টেবিলের উপর ১৫ টা দেশলাই কাঠি নিয়ে ''হোটেল'' শব্দটা লিখেছিলেন। ছেলেটাকে প্রশ্ন করায় ছেলেটা তার সাধ্যমত উত্তর দিল। শেষে, লোকটা টেবিলের মাত্র ৩ টি কাঠি এদিক - ওদিক করে এমন কি লিখলেন যার জন্য ছেলেটা মনখারাপ করে বাড়ি চলে গেল?

*** সমাধান শেষের পাতায়...............

রংপেন্সিলের আঁচড়ে
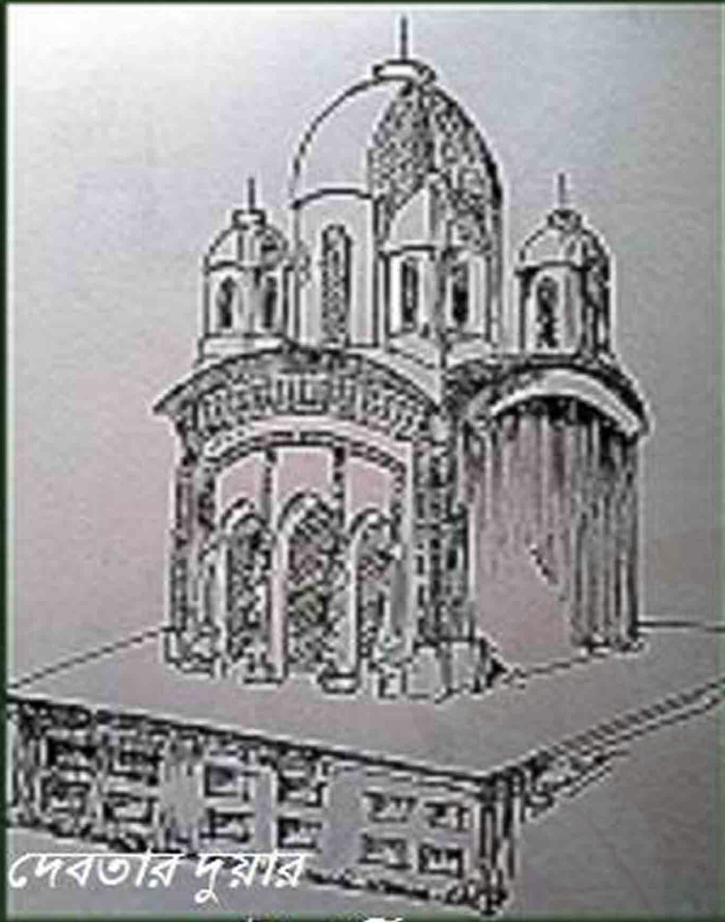
দেবতার দুয়ার

-শুভব্রত ভট্টাচার্জী
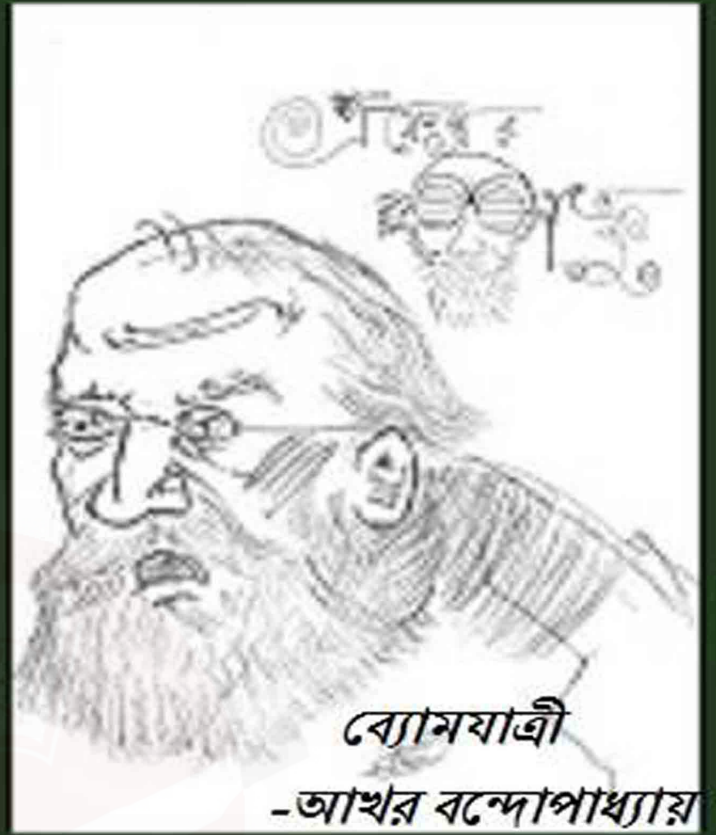
ব্যোমযাত্রী

-আখর বন্দোপাধ্যায়

টিনটিন

-আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর দালান

-শুভব্রত ভট্টাচার্জী

কবিতা
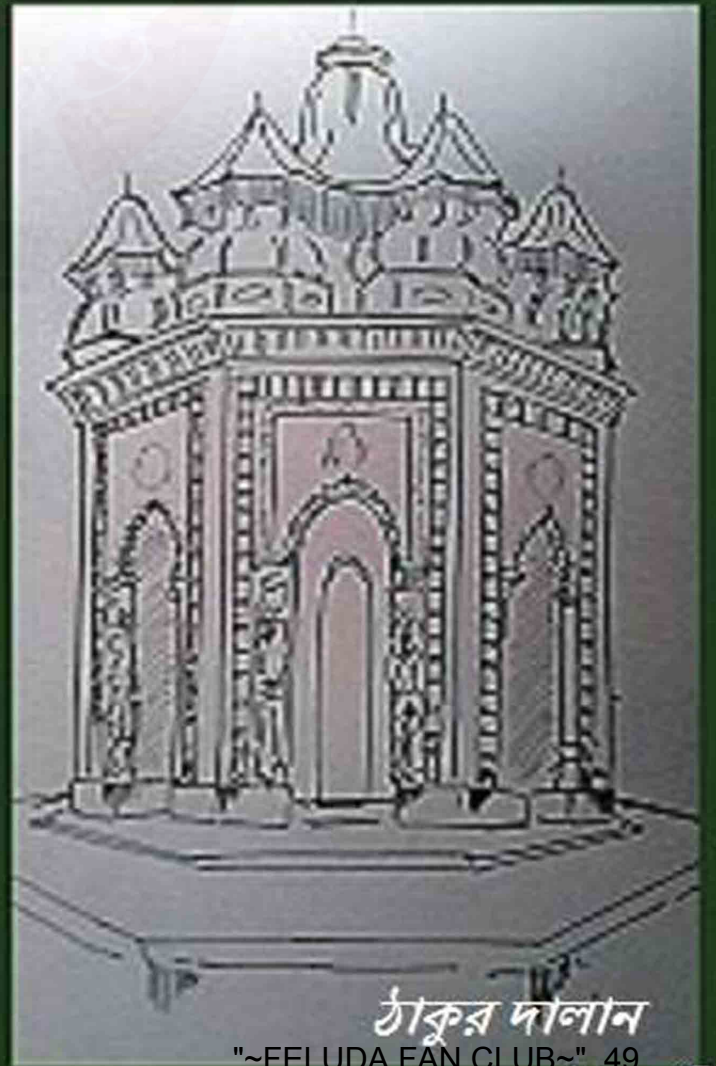
স্বাধীনতা দিবসে

শুভব্রত ভট্টাচার্য

ছেলেবেলাটায় ছবির আড়ালে
স্বাধীনতা মানে ছুটির দিন
ভোরবেলাগুলো প্রভাতফেরীতে
বছর বছর দেশ স্বাধীন

কৈশোরগুলো বইয়ের পাতায়
ইতিহাস খোঁজে সংগ্রামী ডাক
স্বাধীনতা এলো রক্তে ভিজে
ভেঙে দেশ দুটো তবু বেঁচে থাক

যৌবন খোঁজে স্বাধীনতাটাই
প্রেমিক-প্রেমিকা পার্কে বা ক্লাবে
রাজনীতি কেনে যুবকের মন
মগজ ধোলাই স্বাধীনতা ভাবে

বার্ধক্যও উঁকিঝুঁকি মারে
সংসারটাই ভাল ভাবে থাক
দেশ বাঁচে মরে – কি বা এসে গেল?
ছেলেমেয়ে দুটো ভাল খেতে পাক

মৃত্যু কিন্তু স্টপওয়াচ হাতে
মিলিয়ে নিচ্ছে হিসেব ঠিক
সময়-মতন চোখদুটো বুজে
এবার আমায় মুক্তি দিক.....

প্র ব ন্ধ

এমন বন্ধু আর কে আছে

- বাণী চক্রবর্তী

চাণক্য শ্লোকে আছে- " বিদ্যাসম বন্ধু নাই এই ধরাতলে/ রোগসম শত্রু নাই সর্বলোকে বলে।"

বই-এর মাধ্যমে আমরা বিদ্যার মত বন্ধুকে লাভ করতে পারি। এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে হয়ত আরও মাধ্যম আছে, তবু পুরাকাল থেকে চলে আসা এই বই মাধ্যম চিরকালই থাকবে। বই এর মত বন্ধু সত্যিই কিছু হতে পারে না। এ যে আমাদের মনের ক্ষুধা মেটায়। এই বন্ধু কখনও কাউকে বিপথে যেতে দেয় না, বরং সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে; অনেক জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলে। ঘরে বসেই আমরা এই বিপুল ধরণীকে জানতে পারি। তাই বই ভালবাসার ধন, মনের খোরাক। তাই বইমেলা সদা বরণীয়।

সংবাদপত্র খুললেই দেখা যায় সমাজের নানারকম ব্যাভিচারের চিত্র। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভালমন্দ বোধের অভাবে নিজেরই অজান্তে কখন যে কুসঙ্গে পড়ে যায় বুঝতেও পারে না,হয়ে পড়ে নানা প্রলোভনের স্বীকার। এইসব শিশুদের সুস্থ চিন্তা, শুভবোধ জাগাতে পারে বই-এর মত বন্ধু। তাই আমরা বড়রা বা অভিভাবকরাই পারি বই-এর প্রতি ওদের ভালবাসা তৈরি করতে। ছোটবেলায় নানারকম ছোট ছোট গল্প বলতে বলতে ওদেরকে অবশ্যই বইপ্রেমী করে তোলা যাবে, পাশাপাশি ওদের চরিত্র গঠনেও সাহায্য হবে। যেমন, পঞ্চতন্ত্র কথায় আমরা দেখি রাজপুত্রদের চরিত্র গঠনে গল্পগুলো কেমন সাহায্য করেছিল। শিশুরা টেলিভিশান খুলে কার্টুন দেখুক, ডোরেমন দেখুক, পাশাপাশি বইকেও ভালবাসুক।শিশুসাহিত্যিকরা ওদের জন্য যে আনন্দের পসরা সাজিয়ে রেখেছে, সেখানে না গেলে যে ওরা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিতই রয়ে যাবে। আমরা বড়রাই পারি ওদেরকে সেই নির্মল আনন্দে আনন্দিত করে তুলতে। ওরাই তো আগামী দিনের কাণ্ডারী। ওদের হাত দিয়েই হয়তো বা আগামী বইমেলা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

২০১৪ এর আগরতলার বইমেলা শেষ হয়ে গেল। বইপ্রেমীদের মনভার। কারন দুর্গাপূজা,সরস্বতীপূজা এইসব উৎসবের মত বইমেলাও ওদের কাছে বিশেষ একটি উৎসব বা বিশেষ কিছুদিন, যে দিনগুলোর জন্য ওরা সারাবছর অপেক্ষা করে থাকে। বইমেলা আসছে,বইমেলা আসছে- এই ভাব ওদের মনে এক আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেয়। বইমেলার দিনগুলো কাটে নূতন এক উদ্দীপনায়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে মনে মনে চলে সন্ধ্যাবেলায় মেলায় যাওয়ার প্রস্তুতি–হয় দলেবলে নয় একা; কোনও অসুবিধা নেই, বই তো বন্ধু আছেই। বইপ্রেমী ছাড়াও মেলাপ্রাঙ্গনে সমস্তরকম লোকেরই সমাগম হয়।কেউ যায় বই কিনতে; কেউ যায় দেখতে; কেউ বা গল্পগুজব,গানবাজনা ইত্যাদি করতে। এ যেন শুধু বইমেলা নয়, এ যেন এক আনন্দের হাট। তাই বইমেলা আনন্দের মেলাও বটে।
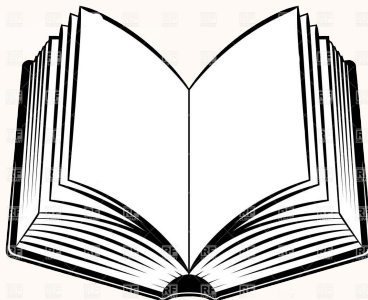
গোরস্থানে সাবধান! ১

চিত্রগ্রাহক : সোমা মজুমদার

গল্প
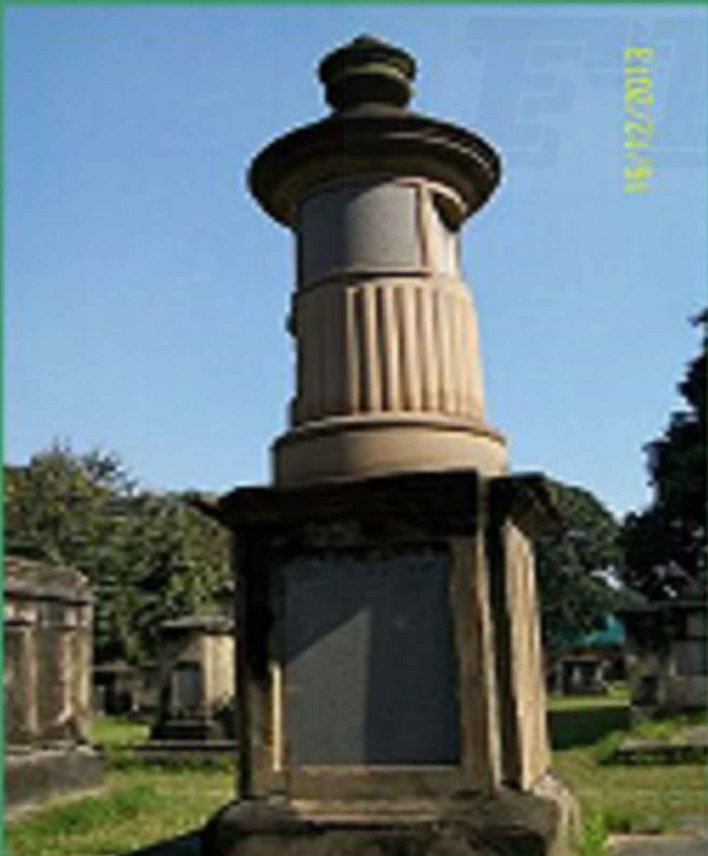
ভবিষ্যতের ভূত

- ডাঃ অশোক দেব

মোবাইলটা এত আসতে বাজছিল যে ভূতেন্দ্রপ্রসাদ ওরফে ভিপির কানে পৌঁছচ্ছিল না। বিরক্ত হয়ে, আশাহত হয়ে স্মৃতিকণা অর্থাৎ সিমটি ফোনটা ছেড়ে গালে হাত দিয়ে অভিমান করে বসল। আর ফোন করবে না। এদিকে ইভনিং শো-এর টিকিট কাটা, কথাটা ভিপির মনে আছে কিনা কে জানে। জ্যান্ত থাকাকালীন কলেজ কেটে কত বই একসাথে দেখেছে। সব সাদাকালো। প্রোমোশান হবার পর প্রোমোশানবার্ষিকী পালনের জন্য এই প্রথম রঙিন ছবি দেখতে যাবার কথা। নামটাও বেশ। "বরফি",- হিন্দি হলেও ক্ষতি কি! যে ছেলেটা হিরো- তার দাদুর একটা ছবির শ্যুটিং দেখার সুযোগ হয়েছিল সিমটির। তখন স্মৃতিকণা সবে বি এ-র গন্ডি পেরিয়ে বিয়ের দিকে এগোচ্ছে। বোম্বাইতে জ্যেঠুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

যাকগে সে অনেক কথা, আপাতত হাতে কোনও কাজ নেই, তাই ল্যাপটপ কোলে নিয়ে ফেসবুক খুলে বসল সিমটি। বিগত চর্চা সংস্থার একান্ত নিজস্ব একাউন্ট খুলে বসল।

বন্ধুর লিস্ট অনেক লম্বা, অনেকেই চ্যাটে আছে। তাদের মধ্যে স্যাবি অর্থাৎ সবিতাকেই পছন্দ হল সিমটির। মেয়েটার উপর খুব মায়া হয়, শশুরবাড়ির অত্যাচারে পালিয়ে এসেছিল বাড়িতে। কিছুদিন পরেই ব্রেস্ট ক্যানসার ধরা পড়ল। প্রথমে অ্যালোপ্যাথি, তারপর হোমিওপ্যাথি, তারপর মা ধ্যানেশ্বরীর প্রসাদ। কোনোকিছুতেই কিছু হল না, অগত্যা এখানে। এখানে এসেও বেচারা মনমরা থাকে চব্বিশ ঘন্টা, ফেসবুকেই তারকার আনন্দ খুঁজে পায়। মিনিত কুড়ি চ্যাট করার পর ভিপির ফোন এল, "তুমি রেডি হয়ে থেকো, আমি বাড়িতে ফিরেই তোমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।" যাক বাবা! মনে আছে তাহলে। ইভনিং শো-এ বরফি, তারপর ফ্লোটেলে ডিনার। ফ্লোটেলই ভাল, কোনও ঝক্কি নেই। গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে চাঁদের আলোয় ডিনার। সেল্ফ সার্ভিস। কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না, চমৎকার!

"মম...!!" ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টার ডাকে সম্বিত ফিরে পেল সিমটি। ওহহ কত রাত হয়ে গেছে- একটুও খেয়াল নেই। "মম-তুমি কি এত ভাবছ? খুব খিদে পেয়েছে আমার।" –"ওকে ওকে!—কিচেনে গিয়ে দেখ আর টি এস সকেটে মাঞ্চুরিয়ান স্পাইরুলিনা আছে, ওটা তোর জন্যে। আর তোর বোনটাকে ডাক

তো।”ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা—তারস্বরে চেঁচিয়ে ডাক্লো—“এই থিটা থ্রি থার্টি থ্রি, তাড়াতাড়ি নিচে আয়, খেতে বসব।” থিটা থ্রি থার্টি থ্রি এলো। ও আবার ভারচ্যুয়াল স্যালাড খাবে। ডায়েটিং করছে তো! খেতে খতে সিমটির ছেলে ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা বলল- “মম।। তুমি আর ড্যাড কি যেন একটা ফিল্ম দেখতে গেছিলে??—বরফি না কি যেন!!” চমকে উঠলো সিমটি—“তুই কি করে জানলি?” -“ওহহ মম ইটস ভেরি সিম্পল! এসিও-তে দেখতে পেলাম...”। তাওতো ঠিক। অ্যান্টি ক্লক অবসার্ভেশানের কথাটা সিমটির মাথায় আসেনি। মাথায় আসেনি কারণ—সিমটি, ভিপি এরা পারে না, কিন্তু ডেল্টা, থিটা এরা পারে। খেতে বসতে না বসতেই ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টার কি হাসি। সিমটি বুঝলো—নিশ্চয়ই ওই মেয়েটা, টু সেভেন্টি এইট সিগমা না কি যেন একটা নাম!! আজকাল তো সাইকোফোন। ওকে ফোন করব মনে করলেই ওর মগজে অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু করে। সিমটির অবশ্য অ্যান্টিক টাচস্ক্রিনটাই ভাল লাগে। অনেকদিন আগে, একদিন অফিসফেরতা ভিপি একটা বোতাম টেপা ফোন নিয়ে এসেছিল। সে কথা মনে পড়তেই সিমটি ফিক করে হেসে ফেললো। অতীতের অনেক কথা মনে পড়ে যায়।

ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা তখন ওর পেটে অঙ্কুরিত হচ্ছে। সেদিন সকালেই ঘটমান পত্রিকায় একটা নোটিশ পড়েছিল সিমটি তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগের মন্ত্রী শ্রী সি.গুপ্ত ঘোষনা করেছেন যে এখন থেকে যাদের সন্তান হবে তাদের রেজিস্টার করতে হবে বিভাগে এসে। সন্তানের আলাদা কোনও নাম রাখা যাবে না। বিভাগ থেকে ডিজিট্যাল কোড দিয়ে দেওয়া হবে। স্কুলে, কলেজে, চাকরির ক্ষেত্রে, বিয়ের সময়, এমনকী ডেথ সার্টিফিকেটেও ঐ কোডটাই ব্যবহার করা হবে। ঘোষনাটা পড়েই ভিপিকে দেখালো সিমটি। ভিপিতো রেগেই আগুন। আমার ছেলের নাম আমি রাখব, তাতে কার বাবার কী !! পরে অবশ্য ব্যাপারটা বোঝা গেল। ইদানীং ওখানের সাইবার হাবে পরপর কতগুলো মার্ডার আর সুইসাইড হয়েছে। তাছাড়াও অনেকদিন ধরেই ক্যাবিনেটে আউটসোর্সিংএর ব্যাপারটা নিয়ে জোরদার আলোচনা চলছিল। ফলে যা হবার তা হয়েছে। যমেশজীর অনেকদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। আই টি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আনকোরা কতগুলি ছেলেমেয়ের হাতে। এখন এসব নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই। প্রথম প্রথম খুব অসুবিধে হতো, খুবই বিরক্তি লাগত এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন বরং এতেই কমফর্টেবল লাগে। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে। ভিপি চুলে ডাই লাগাচ্ছে। এরপর স্নান করবে। তারপর ডিনার। কালকে ভিপির আবাসন মন্ত্রীর সাথে মিটিং। ভিপিরা কাল জোরদার দাবি তুলবে, এভাবে নির্মীয়মাণ বাড়ি, পোড়ো বাড়ি আর রেললাইনের ধারে ঝোপেঝাড়ে টেন্ট খাটিয়ে আর কতদিন থাকা

যায়!!! পাকাপাকি আবাসন না পেলে দিনদিন বিক্ষোভ বেড়েই চলেছে। সংখ্যায় তো কমার কোনোও চান্স নেই। বরং হু হু করে বেড়েই চলেছে।

তিন তিনবার খাদ্য, শ্রম আর আবাসন দপ্তরে মন্ত্রীদের রদবদল হয়েছে, কিন্তু কোনও লাভ নেই। কি করে হবে!! বার্থ আছে, ইনভ্যাশন আছে, মাল্টিপ্লিকেশন আছে, ডেথও আছে বটে, কিন্তু থেকেও লাভ নেই যে! ইরোশান নেই, কেবল রিসাইক্লিং হয়েই চলেছে। এর মধ্যে অবশ্য চাঁদে আর মার্সে বেশ কিছু প্রোজেক্ট নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেতো সবার সাধ্যে কুলোবে না। তাছারা বাচ্চাদের স্কুলিং আছে, হায়ার স্টাডিস আছে। হিমসিম খাচ্ছে মন্ত্রীসভা। কী যে হবে!!

আর্লি মর্নিং উঠে পড়ল ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা। ও এরকম সময়ই ওঠে। ছোটোবেলা থেকেই ও জানে মুনরাইস মানে মর্নিং, আর সানরাইস মানে নাইট। উঠে হাল্কাপুল্কা এক্সারসাইজ।মাঝে মাঝে জিমে যায়-তখন জিম ফাঁকা। ওয়াকার চালিয়ে হাঁটতে থাকে। কিন্তু তাতেও বিপত্তি। একদিন ওদের মাঝরাতে জিমের সিকিউরিটি ঘরঘর আওয়াজ শুনে দৌড়ে জিমে ঢুকে দেখে কেউ কোথাও নেই, কিন্তু অয়াকারটা ছলছে প্রবল বেগে। ও সুইচ টিপে থামিয়ে দেয়, তারপরই ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা চালু করে দেয়। দুচারবার এরকম হবার পর আর থাকতে না পেরে বেচারা সিকিউরিটি গোঁ গোঁ শব্দ করে মুচ্ছো গেল। যাক, আজ ওর তাড়া আছে। ব্রেকফাস্ট সেরে বই খাতা নিয়ে রওনা দিল কলেজের দিকে। ফেলু উপাধ্যায় অর্থাৎ ফেউ এর ক্লাস। খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু তার কথা শুনবে কি!! ক্রমাগত ব্রেনের মধ্যে আল্ট্রাসুফির হাই পিচ টিউন। অগত্যা ভলান্টারি রিসিভ করতেই হল। টু সেভেন্টি এইট সিগমা। কি হচ্ছেটা কি!! পরে ফোন কর—এখন ক্লাস চলছে। ভলান্টারি কাট। ফেউ ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। ক্লাসে কেউ ফোনে কথা বোলো না। কী সর্বনাশ!! অন্তর্যামী নাকি!! তিনটে ক্লাসের পরই কাট্। এবার যেতেই হবে, নইলে টু সেভেন্টি এইট সিগমা রেগে যাবে। ওর রেগে যাবার বহিঃপ্রকাশ আবার সাঙ্ঘাতিক বেপরোয়া। সানরাইজের পর টানতে টানতে নিয়ে যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিম্বা ময়দানে। সেখানে ওর সাথে ল্যাটিনো কিম্বা সাম্বা নাচতে হবে। একবার এরকম করতে গিয়ে ভিষম কান্ড হয়েছিল। নাচছে তো নাচছেই—সাথে সাথে ওকেও নাচতে হচ্ছে। নাচতে নাচতে এক ফুচকাওয়ালার ঝুড়িতে গিয়ে ধাক্কা.. ঝুড়ি সমেত ঘুমন্ত ফুচকাওয়ালার ঘাড়ে। সে বেচারা তো ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠেই কান্না জুড়ে দিল। ভদ্রতাবসত ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা ঝুড়িটাকে ধরে সোজা করে দিতে গিয়েই বিপত্তি। ফুচকাওয়ালা কান্ড দেখে মুখে গোঁ গোঁ শব্দ করে সেই যে বেহুঁশ হল, মুখে চোখে অবশিষ্ট তেঁতুল জলের ঝাপটা মেরেও কোনও লাভ হল না। বরং সেদিন

রাতেই দেখি রেজিস্টারে নাম উঠেছে সুমোর, ওরফে সুখরাম মোহাতোর।

অনেক দিন ধরে চলছে বইটা। অস্কারেও নাকি গেছিল। কিন্তু ডাল গলেনি। হলে সেরকম ভীড় নেই। পাশাপাশি দুটো সিট পাওয়া গেছে। ক্রমশ জমে উঠছে ছবিটা। নায়ক নায়িকা দুজনেই বোবাকালা... এখানে রেজিস্টার্ড হলে স্পেশাল ক্যাটাগরি পাবে। কিন্তু ছবিটা সত্যি দারুণ। অনেকক্ষণ থেকেই কাঁদছে সিমটি। কেঁদে কেঁদে রুমাল ভিজিয়ে ফেলেছে। ডিহাইড্রেশন হবার আগেই বইটা শেষ হল। আর ঠিক সেই সময় টাটাসেন্টারের ছাতে পাঁচিলের ওপরে ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা আর টু সেভেন্টি এইট সিগমা। কে বলে রাতের কলকাতা নিরাপদ নয়! ওদের পক্ষে যতটাই রিস্কি এদের পক্ষে ততটাই নিরাপদ। সিগমার ঘাড়ে হাত রাখলো ডেল্টা আরও নিবিড় হয়ে এল দুজন। সিগমা আজকে একটা দারুণ পারফিউম দিয়েছে। প্রায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল দুজন। ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটে গেল। কথা নেই বার্তা নেই, সিগমা বুঝতে পারলো যে ডেল্টার বাহুবন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে হাত পা খিঁচতে খিঁচতে মৃগী রুগীর মতো টাটাসেন্টারের ছাতের ওপর শুয়ে পড়ল ডেল্টা। ঘটনাটা এতই চকিতে ঘটে গেল যে সিগমা কিছু বুঝে উঠতেই পারছে না। ওর সামনেই ছাতের ওপর পড়ে আছে ডেল্টার নিস্পন্দ দেহ। শ্বাস চলছে না। বুকের ধুকপুকানি থেমে গেছে। আতঙ্কে, দুঃখে যত জোরে পারে চিৎকার করে উঠল সিগমা –"হেল্প হেল্প".. কাকস্য পরিবেদনা। ওর চিৎকার ঘুমন্ত মহানগরীর আকাশে বাতাসে বাষ্পের মতো উবে গেল। কর্কশ শব্দ করে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল একটা প্যাঁচা। একা অসহায় ভাবে ছাতের ওপর বসে পড়ল সিগমা। পরপর ভাবতে শুরু করলো এবার কি কি হবে। কি কৈফিয়ত দেবে ডেল্টার বাড়িতে! এবার কি কি হতে চলেছে মানসচক্ষে দেখতে পারছিল ডেল্টা। তদন্ত টদন্ত কিছু হয় না। শুধু সি গুপ্তর রেজিস্টারে রেজিস্ট্রেশন হয়। সি গুপ্ত মানে চিত্রগুপ্ত। তারপর রিসাইক্লিং হয়। রিসাইক্লিং-এর সময় অপশান দেওয়া হয়। ফ্যামিলি থেকে একই ডিজিটাল কোড চাইলে সেটা দেওয়ার সিস্টেম আছে। ফলে নাম ধাম কিছুর কোনও চেঞ্জ হবে না, শুধু রেজিস্টারে একটা রেড মার্ক থাকবে। এই সব সাতপাঁচ ভাবছিল সিগমা, এমন সময় প্রকান্ড এক হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল ডেল্টা। সিগমা আঁতকে উঠল, বলল "কি হয়েছিল তোমার ড্যুড!!"...

কিছুক্ষণের জড়তা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল ডেল্টা। বলল "ডার্লিং আমার এক্সাক্টলি কি হয়েছিল বলতো!! তোমাকে এত কনফিউসড আর আপসেট লাগছে!!" সিগমা তো আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বলল- "আমিও তো এক্সাক্টলি সেটাই জানতে চাইছি !! তোমাকে ইমিডিয়েটলি ডাক্তার দেখাতে হবে। আমার জ্যেঠুর ঠিক এরকম হয়েছিল। এটাকে নাকি সিক সাইনাস সিনড্রোম বলে।" হঠাৎ ডেল্টার

সব মনে পড়ে গেল- "আরে না না। সিনড্রোম টিনড্রোম কিছু নয়"... "তাহলে কী?" ---"আর বোলো না... হতভাগাগুলোর জন্যে মরেও শান্তি পাব না। প্ল্যাঞ্চেট করার আর সময় পেল না!!"... "কারা ওরা??" – "কারা আবার! আমার স্কুলের বন্ধু ছিল ওরা। সব কটা একসাথে মাল খেয়ে প্ল্যাঞ্চেট করতে বসেছে। যত্তসব।" --- "না না বাবা তাহলেও তুমি কাল একবার ডাঃ প্রেসিকে দেখিয়ে নিও।" --- "প্রেসি কে?" – "আরে উনি আমার কাকুর বন্ধু। সাইকোনিউরোলজিস্ট।" "আরে ছাড় তো – ওসব কিছু লাগবে না। আমি তোমায় তো খুলে বললাম কি হয়েছিল।"

ওদিকে সিমটি আর ভিপি ঘরে ফিরেছে। সত্যি দারুণ ছিল ছবিটা। অসাধারণ অভিনয়। ছেলে মনে হয় বাপ দাদাকেও ছাপিয়ে যাবে। ঠিক ডিনারের সময় ফিরল ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা। "কোথায় গেছিলি?" -সিমটির প্রশ্ন। "তোকে এরকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?" – "আরে আর বোলো না মম্! আমার স্কুলের বন্ধুরা প্ল্যাঞ্চেটে বসে আমাকে কল্ করছিল। তাই হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে গেলাম।" –"সঙ্গে কে ছিল?" –"সিগমা ছিল মম্।" – "ওগো শুনছ? দেখ তোমার ছেলের কি হয়েছে।" ডিনার টেবিলে বসে ডিটেইলসে সব শুনল ভিপি, তারপর গম্ভীর মুখে বলল –"নাহঃ এসব ব্যাপার একদম নেগলেক্ট করা যাবে না। কালই আমি ডাঃ প্রেসির সঙ্গে একটা এপয়েন্টমেন্ট করছি।" খুব বিরক্ত হল ডেল্টা, সিগমাও এই নামটাই বলছিল। "কে এই ডাঃ প্রেসি?" -"ডাঃ প্রেতেন্দ্র সিংহ, খুব নামি সাইকোনিউরোলজিস্ট।" ডিনারের শেষে আধঘন্টা নিউজ দেখার অভ্যাশ আছে ভিপির। কিন্তু আজকাল আর তেমন ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় না। চ্যানেল খুললেই কে কি বলেছে! কেন বলেছে! কথাটা বলা উচিত হল কিনা! এই নিয়ে বিশ্লেষণ। ভূতানন্দ আর দিনভর চ্যানেলে খালি এসব দেখানোর প্রতিযোগিতা চলেছে। তার মধ্যেই ক্র্যাশিং নিউস দেখাচ্ছে আবাসন মন্ত্রীর ইন্টারভিউ। বলছেন নিদারুণ স্থানাভাবে চাঁদে বিশাল স্যাটেলাইট সিটি করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। জনগণকে অপশান দেওয়া হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুনারহাট টাউনশিপে বুকিং করুন। প্রেতসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর ঘোষনাও দেখানো হল, উনি বলছেন মাত্রাতিরিক্ত অনুপ্রবেশ, অনিয়ন্ত্রিত প্রজনণ এবং কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রিসাইক্লিং পদ্ধতি রদ করে দেওয়া হবে। ফলে স্বভাবতই বেশ কিছু ডেথসার্টিফিকেট প্রাপ্তকে আবার মর্তে স্থানান্তরিত করা হবে। খবরে আবার এটাও দেখাচ্ছে যে প্রশাসনের এই অবিমিশ্যকারী ফ্যাসিস্ট ঘোষনার বিরুদ্ধে প্রেতাধিকার কমিশন যমাদালতে মামলা করতে চলেছে। ডেল্টা জাঙ্ক স্যুপ খেয়ে শুয়ে পড়েছে। সিমটিকে দেকে খবরটা দিল ভিপি। বুকিংটা করে রাখাই ভালো। কিন্তু রিসাইক্লিং বন্ধ করে দেওয়ার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রশাসন নিলো কিভাবে!! ভাবতেও ভয় লাগে। ওদের কি

ভোটের ভয় নেই!! কে যেন বলেছিল- "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে... *** এর মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" রিডিকুলাস!! টিভিতে খবরটা দেখে সবারই মন খারাপ হয়ে গেছিল। হঠাৎ সিমটির মনে পড়ল, "ওহহো, তোমাকে তো একটা কথা বলতে একদম ভুলে গেছি, এক্কেবারে মনে ছিল না।" –"কি কথা?" —"এই জান কালকে না মিলিরা আসছে।" – "কে? মিলিটা কে?" –"আরে তোমার তো কোনও কথাই মনে থাকে না দেখছি। আমার কলেজের বন্ধু ছিল। বিয়ের পর বরের সাথে মারুতি করে দীঘা যাবার সময় একটা লরির ধাক্কা লেগেছিল না? দুজনেই স্পট ডেড্।" – "ওহো তোমার সেই নন বেঙ্গলি বান্ধবী! যাকে তোমরা মিস্ লিজা বলে ডাকতে, আর ছেলেটির নামতো রাজা আই মিন রাজেশ জাদেজা। কি? এবার ঠিক বলছি তো?? তা ওরা থাকে কোথায় এখন?" –"ওরা তো সাউথ কলকাতার একটা মাল্টিস্টোরিডে থাকে। ফ্ল্যাটটা নাকি দারুণ। ফ্ল্যাটের মালিক থাকে কুয়েতে বছরে একবার শুধু পুজোর সময় আসে। সে'কটা দিন ওরা ম্যানেজ করে নেয়।" - এবার সিমটি-ভিপির হাতটা ধরে আরও ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করল। বলল-"জানো! ওখানে নাকি আরও অনেকগুলো ফুল্লি ফার্নিশড এপার্টমেন্ট আছে। একটু ভাব প্লিজ! এই ভাঙ্গাচোরা পুরোনো বাড়িটাতে থাকতে থাকতে একদম হাঁফিয়ে উঠেছি। কিছু একটা কর না প্লিজ।" এবার ভিপি একটু সিরিয়াস হয়ে গেল। - "কি হল? কথা বলছ না যে!" সিমটি আকুতি করে। এবার সরু গোঁফের তলায় একটু মুচকি হাসির রেখা টেনে ভিপি বলল- "আমাকে বোকা পেয়েছ? এরকম একটা কিছু হতে পারে ভেবে অনেকদিন আগেই লুনার সিটিতে একটা ফ্ল্যাট বুক করে রেখেছি। আর তুমি মিলিদের যে মাল্টিস্টোরিডের কথায় লাফাচ্ছ, সেটার গল্প শুনবে?- আমার অফিস কলিগ শশা মানে শশাঙ্ক পাত্র বিলডিং এর ষোলো তলায় ওরকম একটা দারুণ এপার্টমেন্ট পেয়েছিল। বেশ ছিল সুখে শান্তিতে; ভালোই চলছিল সবকিছু। এক রোববারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরতে গেছিল বাচ্চাদের নিয়ে। সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরে দেখে মিস্টার চক্কোত্তি দুবাই থেকে ফিরেছেন সপরিবারে বেশ লম্বা ছুটি কাটাতে। কি বিপত্তি দেখতো! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ওদের মেয়েটা খুব টায়ার্ড ছিল। নিজের বেডরুমে গিয়ে ধপ্পাস্ করে পড়তে না পড়তেই আঁতকে উঠে দৌড়। কাঁদতে কাঁদতে, হাঁফাতে হাঁফাতে মায়ের কাছে এসে পউছল। মাম্মি মাম্মি, আমার ঘরে না একটা চোর ঢুকেছে, আমার বিছানায় শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে গান শুনছে।" – "তারপর?" – "তারপর আর কী। রাতারাতি অন্যত্র শিফটিং। চক্কোত্তিরাও বুঝল সামথিং রং। পরের দিন আবাসিকদের মিটিং-এ চক্কোত্তি কথাটা তুলতেই অনেকেই বোঝা গেল একই জ্বালায় ভুগছেন। অতএব মিটিং-এ ঠিক হল বাস্তু বিশেষজ্ঞকে ডাকা হবে। কেউ বা শাস্ত্রমতে যজ্ঞ

করল, কেউ বা বাড়িতে ফেংশুই করে নিল। ব্যাস। এখান ঐ সমস্ত ঘরে আমরা ঢুকলেই ৪৪০ ভল্টের কারেন্ট লাগে। ভাবছি যে থিটার পরীক্ষা হয়ে গেলেই একবার সবাই মিলে ঘুরে আসব-- লুনার সিটিতে আমাদের ফ্ল্যাটটা কেমন হল দেখতে।"

পরের দিন জোর খবর। কোথায় একটা প্রকান্ড ন্যাচারাল ডিস্যাস্টার হয়েছে, তাই অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক অনুপ্রবেশ ঘটবে। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে রেড অ্যালার্ট দেওয়া হয়েছে, তারা যেন প্রতিটি বাড়িতেই দু'তিনটে করে ফ্যামিলিকে থাকতে দেয়। ডেল্টা আর থিটার তেমন কনও মাথাব্যাথা নেই। স্কুল কলেজ চলছে নিয়মিত। আড্ডাও চলেছে জোরকদমে। ওরা জানে যে সামনেই ছুটি আর ড্যাড্ অলরেডি টিকিট কেটে রেখেছে লুনারক্রাফ্টে। মিলি আর রাজা এল বেলার দিকে। ডিনার সেরেই ফেরার প্ল্যান। তাই কোনও তাড়াহুড়ো নেই।

মিলিদের সাথে মূলত যে বিষয়ে আলোচনা হল সেটা পাকাপাকি আস্তানা নিয়ে। বোঝা গেল যে ওরা আপাতত সুখে শান্তিতে থাকলেও মনের মধ্যে একটা চাপা টেনশন সবসময়ই কাজ করে, এই বুঝি ওরা এসে গেল। রাজা আলাস্কায় একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে। মাস চারেক আগে রাজা একবার দেখতে গিয়েছিল আইস টানেলের মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হয় বটে, কিন্তু ইন্টিরিয়র ডেকোরেশান দারুণ করেছে। ডিনারের আধঘন্টা আগে একটা দু'শ বছরের পুরোনো ওয়াইন খুলে বসল ভিপি। জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার পর এলাহি ডিনার। যাবার বেলায় ভিপি রাজাকে মনে করিয়ে দিল, সাবধানে গাড়ি চালাস কিন্তু! মনে রাখিস রিসাইক্লিং উঠে গেছে। বাই বাই করেও ওরা চলে গেল।

আজ সকাল থেকেই ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টার মনটা একদম ভাল নেই। থ্রি থার্টি থ্রি থিটা নিজের ঘরে পড়ার টেবিলে বসে হাঁপুস নয়নে কেঁদেই চলেছে। ইতিমধ্যেই ওর চলে যাবার ব্যাপারে ওর বন্ধুদের জানিয়ে দিয়েছে। আজকে ছুটির দিন। ভিপির অফিস নেই, বসবার ঘরে বসে টিভিতে মেগানিউজ দেখছিল। আর সিমটি ঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে নিচ্ছিল। আজকে আবার মিসা আসবে না। সপ্তাহে এই একটাই দিন ছুটি। মেয়েটা বড্ড ভাল, খুব কাজের, আজ ছুটি, তাই সব রান্না করে ফ্রিজে রেখে গেছে। মেয়েটা কিন্তু বড় দুখি। ছোটোবেলায় মা হারিয়েছিল। বাবার কাছে মানুষ। কিন্তু একবার জলবসন্তের মড়ক লাগলো পাড়ায়। তখন সবে মাত্র ওর বিয়ের কথা চলছে। ডাক্তার, হাকিম, বৈদ্য সবই হল, কিন্তু মিনতি সাহাকে আর রাখা গেল না। একই রাতে বাবার হাত ধরে চলে এল এখানে, সেই থেকেই ভিপিদের বাড়িতে কাজ করে। গুটি গুটি পায়ে উপর থেকে নেমে এল ডেল্টা। মোবাইল ফোনের মতো একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে বাবার পাশে সোফায় এসে বসল। ভিপি বলল – "এটা

কী!” –“এটা প্রেডিকটোমিটার ড্যাড্। তুমি সব ইনফো ইনপুট করে কোয়ারি কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রোসেসিং করে প্রেডিকশন দিয়ে দেবে।” “বুঝলাম, তাতে কী হল? আমায় কি করতে বলছিস?” –“জাস্ট তোমাকে দেখাতে এনেছি। যতবারই সব ইনফো দিয়ে এন্টার মারছি, ততবারই বলছে আমাদের ব্যাক টু লাইফ যেতেই হবে। একবারও চাঁদের প্রবাবিলিটিটা দেখাচ্ছে না। ড্যাড্- তুমি যমেশজীর দিব্যি করে বল-সত্যি চাঁদে ফ্লাট নিয়েছতো? আরও আশ্চর্যের কথা কি জান? সিগমার প্রেডিকটোমিটারও তাই বলছে। ওর ড্যাডি সাউথ পোলে ফ্লাট নিয়েছে। খুব স্যাড লাগছে। কত করে বোঝালাম- পাকাপাকিভাবে চাঁদে চলে এস, পোল টোলে গেলে কসমিক এনকাউন্টারে বরফ টরফ সব গলে যাবে।” ও বলল, “ওর ড্যাডের নাকি ফিজির কাছে কোন একটা দ্বীপে ল্যান্ড বুক করা আছে। এটা নাকি সেকেন্ড অপশান।” সিমটি একটু দূর থেকে সব শুনছিল। বলল- “তুই কি সিগমাকে বিয়ে করবি?” –“অবভিয়াসলি মম -হ্যাঁ করব। যদিও ও এখনও স্কুলের গন্ডি পেরোয়নি, - কিন্তু তাতে কী ! আমিতো স্পিরিচুয়াল রেসার্ভাশান করেই নিচ্ছি। ওর পড়াশুনা হয়ে গেলে চাঁদে নিয়ে যাব।” এইসব কথাবার্তা চলছিল আর ভিপির কান গরম হয়ে উঠছিল। এমন সময় আচমকা ভারচুয়াল কলিংবেলটা বেজে উঠল।– এখন আবার কে এল! ভিপি উঠে দরজা খুলে দিল। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে চারজন অফিসার এসেছেন, আর তাদের পিছনে বিভিন্ন বয়সের মহিলা পুরুষ মিলিয়ে জনা কুড়ি লোক। একজন অফিসার প্রশ্ন করলেন, “আপনি কি ভি আই পি?” – “না, আমি ভি আই পি নই, আমি ভিপি। কেন, কি ব্যাপার বলুনতো! এত সকাল সকাল! আর পিছনে ওরা কারা?” – “না, তেমন কিছু নয়, ডিপার্টমেন্ট থেকে এই তিনটে ফ্যামিলিকে এলট করা হয়েছে। এখন থেকে ওরা এই বাড়িতে আপনাদের সাথেই থাকবে।”

মাথায় বাজ পড়ল ভিপির। ডিসগাসটিং!! “আমাদের এখানে জায়গা কোথায়? এসব কি বলছেন আপনারা!!”--- “কিছু করার নেই সাহেব, এই দেখুন ডিপার্টমেন্টের নোটিশ। পরিষ্কার বলা আছে-অনিচ্ছুক হলেও উপায় নেই। ...” –“আমাদের এখানে সত্যি জায়গা নেই,- আপনারা বরং ক্যানাল ওয়েস্টে দেখুন।” – “দেখেছি স্যার, ওখানেও হাউসফুল। তাছাড়া ওখানে নতুন প্রজেক্টের জন্যে জমি এক্যুয়ার করা আছে।” অগত্যা, বামাল হুড়মুড়িয়ে ভিপির ঘরে ঢুকে পড়ল তিন তিনটে পরিবার। বাচ্চা বুড়ো, দাদু, নাতি, মাসিমা পিসিমা, বাবা কাকা, জেঠু, জেঠি নিয়ে ...। উফফ, ভাবা যায় না। আপাতত সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়েছে বসবার ঘরে। দুটো বাচ্চা তারস্বরে কান্না জুড়েছে। মাথায় তিলক কাটা, টিকিওয়ালা একটা লোক ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো আধভাঁজ করে পরেছে, ওদিকের কোণে এক বুড়িমা পানের ডিবে থেকে পান সেজে খাচ্ছে, দুটো কম বয়েসি ছোকরা আবার ব্যালকনির কোণে

গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে। বীভৎস আনবিয়ারেবেল ... একটা কিছু করতেই হবে। অফিসারকে বিদায় জানিয়ে ভিপি ফিরে এসে দেখে – সোফায় ওর বসবার জায়গায় বিশাল একটা ধুমসো লোক পায়ের ওপর পা তুলে আয়েশ করে বসে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ঘন ঘন চ্যানেল চেঞ্জ করেই চলেছে। ... আর দেরি করলো না ভিপি।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে নিয়ে উপরের ঘরে উঠে এল। ডেল্টা দারুণ খেপে গেছে।– "ড্যাড, এক্ষুণি লুনার্ক্রাফ্ট অফিসে ফোন কর, টিকিট প্রিপোন করিয়ে আজকেই বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে এই রাবণের গুষ্টির সাথে এক বারিতে থাকা অসম্ভব।" লুনার্ক্রাফ্ট অফিস থেকে জানল,- "হ্যা, টিকেট আভেলেবেল, আসলে এখন রাশটা খুব বাড়েনি।" সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে টিকিট প্রিপোন করে নিল ফোর ফিফটি সেভেন ডেল্টা। হাতে এখন মাত্র তিন ঘন্টা সময়। স্নান সেরে কাগজ, পেন নিয়ে বসল ভিপি আর সিমটি। থিটা তো কেঁদেই চলেছে। ডেল্টা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কান্না থামিয়ে – তাড়াতাড়ি সাজগোজ সেরে ফেলতে বলে নিজের ঘরে চলে গেল রেডি হবার জন্যে। গয়নাগাটি, পোষাক-পরিচ্ছদ মানে ভিপির দামী দামী স্যুটগুলো, সিমটির সাধের টাঙ্গাইল, জরজেট, কাঞ্জিভরম সিল্ক, ডেল্টা আর থিটার ফেভারিট ড্রেসগুলো, ল্যাপটপ, মোবাইল, আইপ্যাড নাইন্টি সিক্স, সুপার আইপড- ইত্যাদি সব মিলিয়ে মোট চারটে স্যুটকেস। চিরবিদায় জানিয়ে যেতে হবে। বন্ধু বা পরিচিতদের কাউকে জানানোর সময় পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা অবশ্য কোনো সমস্যা নয়। আই পি ডি অর্থাৎ ইন্টারপ্লানেটারি ডায়ালিং পরিসেবা চালু হয়ে গেছে। ডিপারচারের এক ঘন্টা আগে পৌঁছতে হবে। স্টেশনটা তো বাইপাসের ধারে, বিগ বাজারের কাছাকাছি। বিষন্ন মনে সবাই নিজের ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। নিচে বসবার ঘরে নরক গুলজার। হই চই, কাচ্চা বাচ্চা, চীটকাড় চেচামেচী--- ওহ্ দুরবিষহ। হরিবেল!!.... এরই ফাঁকে সিমটি শেষবারের জন্যে ল্যাপটপ খুলে বসল। ফেসবুকে যদি পরিচিত কাউকে পাওয়া যায়। ভিপি বাথরুমে শেভিং করছে। সবারই খিদে পেয়ে গেছে, কিন্তু উপায় নেই, কিচেন, ডাইনিং সব হুলিগানদের দখলে। এমন সময় আকাশ বাতাস ছাপিয়ে একটা চাপা গুড়্গুড় শব্দ। ভীষণভাবে দুলতে লাগলো বাড়িটা। দুলছে তো দুলছেই। আলমারি, কাচ, বাসনকোসন, সব কিছু ভেঙে চুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। আরও বেড়ে গেল ঝাকুনি। দুড়দাড় করে ছাত ভেঙ্গে পড়ছে । চারিদিকে শুধু আর্ত চিৎকার আর কান্নার রোল। --- এ তো ভূমিকম্প! ভীষণ ভূমিকম্প! মিনিট তিনেকের ব্যাপার, সব শেষ। এ যেন মহাপ্রলয়। ভিপির বাড়ি সমেত আশেপাশের সব বাড়ি কংক্রীট আর লোহার স্তূপে পরিণত হয়েছে। চারিদিক নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্দ। এরই মধ্যে সিমটির সাধের ল্যাপটপে খোলা রয়েছে ফেসবুক। আর ডেল্টার মুঠো করা হাতে ধরা ভাঙ্গাচোরা

প্রেডিকটোমিটার থেকে সাফল্যের আওয়াজ আসছে—বিপ-বিপ-বিপ... আসলে কি হয়েছিল জানেন? যমেশজীর সাধের আইটি ডিপার্টমেন্টে নবাগত একটি ছেলে সিস্টেম কাস্টমাইস করার সময় সিস্মো ইনডিউসার প্রগ্রামকে ভুল করে একটিভেট করে দিয়েছিল৷

<u>ডাঃ অশোক দেব</u>

ভূতের ভবিষ্যৎ কিম্বা ভবিষ্যতের ভূত, এই দুটো বিষয়েরই কোনোও শেষ নেই৷ নিশুতি রাতে অনুকূল পরিবেশে শেষ করব ‘‘ভবিষ্যতের ভূত’’-এর প্রথম পর্ব৷ আপনারা সবাই জানেন যে ওরা ফিরে ফিরে আসে৷ তাই, ভূত রিটার্নস-এর সম্ভাবনা নিয়েই শেষ হবে আজকের কাহিনী৷ যদি কারোর ভয় লাগে, একঘেয়ে লাগে অথবা বিরক্তি হয়, তবে আমার কোনও দোষ নেই৷ সব দোষ ভূতেদের৷

গোরস্থানে সাবধান! ২

চিত্রগ্রাহক : সোমা মজুমদার

কবিতা

নতুন বছর, পুরোনো শহর

শিবাদিত্য দাশশর্মা

আরো একটা বছর কেটে গেল।
এই শহরের হাজার হাজার লোকের কোটি কোটি স্বপ্ন,
কিছু স্বপ্ন ধুলায় মিশে গেল,কিছু তার নিজের রাস্তা বেছে নিল!
সত্যিই তো,গ্রীষ্ম,বর্ষা,শীত...এরা সবাই যেন স্কুল টিচার..
তাদের নিজস্ব পড়া, তারা পড়িয়ে চলে গেল...
আর আমি?
লাস্ট বেঞ্চে বসা ছেলে, অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলাম।
কখনো অনুভব করলাম বসন্ত কালের কোকিলের ডাক...
কখনো শুনতে পেলাম বর্ষাভেজা কাকের হৃদকম্পন,
কিংবা হারিয়ে গেলাম শীতের রাতে শহরের নিস্তব্ধতায়।
আর রাই, তুমি?....তুমি কি আজও সেই লাস্ট বেঞ্চে বসে?
তবে তোমার জন্যে আসছে আরো একটা বছর....
দেখে নাও সেসব এবার যা আগে দেখনি....
শহর আমার....শিখে নাও এবার সেসব যা আগে শেখনি..
এসেছে তোমার জন্য আরেকটা নতুন বছর!!

নতুন আশা

- ঋজু পাল

"নাহ্, মা এই বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না।"

কালো মেয়েটির চোখের ভাষা বদলে গেছে, তাতে প্রকাশ পাচ্ছে অনেকদিনের লুকিয়ে থাকা চাপা অভিমান, অসন্তোষ আর রাগ।

থমকে গেল মেয়েটির মা। 'কি বলছিস তুই!!! এত্ত ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া করে দিবি!! বলি মতলব কি তোর!!'

মেয়েটি একপলক চেয়ে রইল মায়ের দিকে, তারপর মৃদু স্বরে বলল –"আমি পড়তে চাই মা! অনেক দূর যেতে চাই, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়"।

ভাবছেন, এটাই কি গল্প, নাহ্ বন্ধু আজ আর গল্প বলব না। এটা যে চরম বাস্তব, যে বাস্তবের কষাঘাতে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত, ক্ষত বিক্ষত হতে হচ্ছে কত না নাম না জানা মেয়েদের। কোথাও সভ্যতার অভিশপ্ত দিক গ্রাস করছে তাদের, তো কোথাও তাদের চারপাশে থাকা মানুষই তাদের ঠেলে দিচ্ছে এক মৃত্যুরূপী দায়িত্বের করালগহ্বরে -------যার নাম "যন্ত্রণা"।

সেদিন ট্রেনে যেতে যেতে শুনছিলাম, দুজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির কথোপকথন। একজন হঠাৎ বললেন "আজকাল খবরের কাগজ খুললেই কেবল মেয়েদের নিয়ে খবর , এরা এসব কেন যে ছাপায় কে জানে!!" হঠাৎ করে কথাটা শুনে ভারী খারাপ লাগল, কিন্তু পরে ঠান্ডা মাথায় ভাবলাম–সত্যিই তো!! কেন আমরা বাধ্য করি খবরের কাগজের লোকেদের এসব ছাপাতে। হ্যাঁ! আমরা; আমি, আপনি, আমরা সবাই দায়ী। দায় এড়ানো কি এতই সহজ বন্ধু! তাহলে তো সমাজ থেকেই আপনাকে আলাদা হতে হবে, সেটা নিশ্চয়ই পারবেন না। তার থেকে বরং একটু না হয় দায়টা নিলেনই।

না, না কোনও সরকারী - বেসরকারী তথ্যে যাব না - কোথায় বাল্যবিবাহ বেশী, কোথায় কম, কোথায় নারী নির্যাতন বেশী, কোথায় কম, কার সাফল্য - কাদের ব্যর্থতা---সত্যি বলতে আজ আর শুনতে ভালো লাগে না। মনটা আজ বড় বিষাক্ত! মাঝে মাঝে ভাবি এই কি আমাদের সমাজ যাকে নিয়ে আমাদের এত গর্ব, এত অহংকার, যেখানে তেরোয় পা দিতে না দিতেই নাবালিকা মেয়েকে বিয়ের জন্য বাধ্য করা হয়, রাজি না হলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারতে দ্বিধা বোধও করে না বাড়ির লোকে। এই সেই সমাজ যেখানে দিদির চোখের সামনে নিষ্ঠুর ভাবে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হয় ভাইকে। এই সেই সমাজ যেখানে অমানবিক অত্যাচার করা হয় মেয়েটির উপর যার পরিণতি হয় মৃত্যু তে। এই সেই সমাজ যেখানে নিজের জামাইবাবু পর্যন্ত নাবালিকা কিশোরীকে নির্যাতন করে নোংরা অন্ধকার গলিতে নির্বাসন দেয়। এই সেই সমাজ যেখানে কর্মরত মেয়ে নাইট শিফটে কাজ করে দেরি করে বাড়ি ফিরলে পাড়ার লোকের নানা কটুক্তির মুখে পড়তে হয়!!!!! ক্লান্ত হয়ে পড়লে বন্ধু! কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তো ক্লান্ত হওয়াও সাজে না আমাদের। কি করছি, কেন করছি তার কোনো সদুত্তর কি আছে আমাদের কাছে? নাহ্! নেই।

আমাদের প্রাচীনতম সমাজের প্রাচীনতম ধারণা। দুর্গাপুজোর মন্ত্রতেও খেয়াল কর বন্ধু ----সেই "পুত্রং দেহি" এর কামনা। কন্যা সন্তান তো বড়ই ব্রাত্য সেখানে। মেয়ে মানেই তো একদিন না একদিন তাকে পরের ঘর করতে হবে; কি লাভ তাকে লিখিয়ে, পড়িয়ে, ডাক্তার /ইঞ্জিনিয়ার করিয়ে, সেই তো বাপু তোমায় বিয়ে করে, বাচ্চা সামলিয়ে রান্নাঘরে পতিদেবতার জন্য উপাদেয় রান্না করতে হবে!! তাহলে??? এটা কিন্তু আমার প্রশ্ন নয়....গোটা সমাজেরই হয়ত প্রশ্ন...বল বন্ধু!! অস্বীকার কোরো না, তুমিও নিশ্চয়ই এটাই ভাবছিলে। জানি, ভাববে বৈকি, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক ভাবার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু দয়া করে নিজের মতামত তা গত সমাজ এর উপর চাপিয়ে দিও না....অনেক তো হলো!!!

আজ আমি কখনোই বলব না এর একমাত্র উপায় হলো মেয়েদের আপন ক্ষমতাবলে সব কিছু জয় করতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি। কেন বল তো?? আমরা এখানেও তো নিজেদের মতামত জবরদস্তি চাপিয়ে দিচ্ছি। আমরা, ছেলেরা পারি না নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে, পারি না ওদের সাফল্যে ঈর্ষার পরিবর্তে গর্বিত হতে, পারি না একে অন্যের হাত ধরে ভালবাসার সম্পর্ক গড়তে যে সম্পর্ক শুধুমাত্র ভ্যালেন্টাইনস-ডে বা প্রেম বা বিয়ে এই ছোট্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শ্রদ্ধার আরেক নামই তো ভালবাসা। বন্ধু, চেষ্টা করে দেখিই না সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সবার সাথে। যদি পারি অন্তত সেদিন আর আমাদের রাজনীতির মিথ্যে কচকচানি শুনতে হবে না।

হায় হায়! কথা ছিল তো নববর্ষ নিয়ে লেখার, দেখ দেখি কি লিখতে কি লিখে ফেললাম! আচ্ছা বন্ধু খুব ভুল কি করলাম!! কি লাভ সেই নতুন বছরের সূর্যকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যার করনসম্পাতে সেই একই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠবে। কি লাভ সেই ভোরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে যে ভোর কোনও নতুন বার্তা নিয়ে আসবে না! আজকাল লাভ আর ক্ষতি ছাড়া সমাজ যে চলে না বন্ধু। তবে, এতটাও হতাশ হোয়ো না বন্ধু। সমস্যা থাকলে সমাধানও থাকবে। আসলে সমস্যার গোড়াতে আঘাত হানতে হবে। সমাধান আপনা হতেই আসবে। আমি সেদিনই নববর্ষ ও নতুন আশার, নতুন আলোর কথা লিখব যেদিন রবিঠাকুরের এই প্রার্থনা বাস্তবায়িত হবে-------

“তোমার প্রকাশ হোক

কুহেলিকা করি উন্মোচন

সূর্যের মতন...........হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মেরও প্রথমও শুভক্ষণ।”
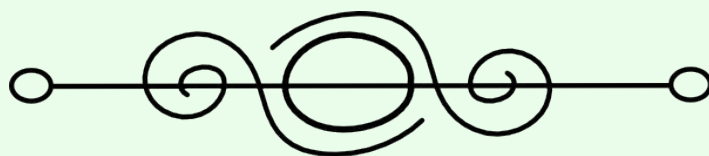
আমার শহর

নীল নির্জনে

-শান্তনু দত্ত

কি যে দেখি! ঠাওর হয়না...

মুক্তার দেশে গুপি বাঘা

চিরঞ্জিত দাস ও অঙ্গনা সেনগুপ্ত

১

"মন্ত্রীমশাই মহারাজা আপনাকে এখনি একবার ছাদে ডাকছেন কিছু জরুরি কথা আছে বলছেন।"

- "হুম, ওনাকে বলো আমি আসছি।"

মাণিক্যনগরীর রাজপ্রাসাদের ছাদে রাজামশাই দোলনায় বসে হওয়া খাচ্ছেন।

মন্ত্রী প্রবেশ করলেন ছাদে।

-"প্রণাম রাজামশাই! আমায় ডাকছেন?"

-"আহা! কি প্রশ্ন! না ডাকলে এখানে করছটা কি তুমি? আহাম্মক!" বলে রাজা উঠে দাঁড়ালেন।

-"ভুল হয়ে গেছে রাজামশাই, অপরাধ নেবেন না" মন্ত্রী ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন।

-"আচ্ছা আচ্ছা! এখন যা বলছি মন দিয়ে শোনো।"

-"আজ্ঞে রাজামশাই..."

-"মন্ত্রী, তুমি নিশ্চয়ই কৃষিমন্ত্রীর করা সমীক্ষার ফলাফল জানো, রাজ্যে চাষাবাদের কি হাল খবর পাচ্ছো। এই ভাবে যদি বেশি দিন চলে তাহলে যে এক মহামারী আসতে চলেছে সেটাও আশাকরি বুঝতে পাচ্ছো। আমাদের মণি মুক্তার কারবার তাই কোষাগার এখনো খালি হয়নি। বাইরে থেকে খাদ্য সামগ্রী আনিয়ে আর কতদিন চলবে? এবার কোষাগার যে খালি হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে কিছু ভাবছ নাকি রাতদিন খেয়ে দেয়ে ঘুমাচ্ছ আর মোটা হচ্ছো?"

-"আজ্ঞে সমুদ্রের ধারে রাজ্য আমাদের তাই চাষ বরাবরই কম হয়। তার ওপর গত কয়েক বছর ধরে সেটাও হচ্ছে না। সত্যি! নতুন চাষী জমি ছাড়া তো এর কোনো সমস্যা মিটবে না রাজা মশাই।"

-"আহা! আমি যেন জানিনা আমার রাজ্য সমুদ্রের পাশে না পাহাড়ের উপরে! নতুন কিছু বলো। তা এ নিয়ে ভেবেছ কিছু? গত কয়েক বছর ধরে খাজনাও কম করতে হচ্ছে। বেত মারলে তো আর ফসল ফলেনা। এবার হাতে হাত রেখে বসার সময় নয় মন্ত্রী।" একটু চেঁচিয়ে বলে রাজা বসে পড়লেন।

আবার একটু ভেবে বললেন "আচ্ছা মন্ত্রী আমাদের সৈন্য দল আশেপাশের রাজ্যের তুলনায় এখন কেমন?"

-"তা আজ্ঞে রাজামশাই সৈন্য দল আমাদের বরাবরই ভালো।"

-"আমাদের সীমানায় এখন কোন কোন রাজ্য আছে বেশ?"

-"আজ্ঞে বৈদুর্য্যনগর, কনিষ্ক, শাল্মলী, চম্পকনগরী আর শুণ্ডি এই পাঁচটা আগে ছ'টা ছিল হাল্লা আর শুণ্ডি এক হয়ে গেছে এখন তাই পাঁচটা।"

-"পাঁচটার মধ্যে চাষযোগ্য জমি কার বেশি?"

-"শুণ্ডি হুজুর, আমাদের রাজ্যের ঘাটতি তো ওদের থেকেই মেটে। শুনেছি প্রচুর সবুজ জমি চারিধারে। এই দিয়েই রাজ্য চলে।"

-"হুম, তা এই শুণ্ডি যদি আমাদের হাতের মুঠোতে চলে আসে? তাহলে কেমন হয়?"

-"আজ্ঞে হুজুর খুব ভালো হয়। শস্য, ফল, ফুল নিয়ে ভাবতে হবে না। তার উপর খাজনাও বাড়বে আর আমাদের মুক্তার টাকা কোষাগারে জমবে" বলে হাসি মুখে রাজার দিকে তাকালেন মন্ত্রী।

-“হুম, বুঝলাম। শুণ্ডির গুপ্তচরকে খবর দাও যেন এখনি সে শুণ্ডি ছেড়ে আমার কাছে আসে।”
-“শুণ্ডির গুপ্তচর মগনলাল আমাদের রাজ্যেই আছেন আপনি বললে এখনি ডেকে পাঠাই?”
-“ডেকে পাঠাও।”
মন্ত্রী চেঁচিয়ে পেয়াদাকে বললেন “মগনলালকে খবর দাও, বলো রাজামশাই এখুনি তলব করেছেন।”

কিছুক্ষণ পর...
-“নমস্কার রাজামশাই, নমস্কার মন্ত্রীমশাই!” বলে গুপ্তচর দাঁড়িয়ে রইলো।
-“তা মগনলাল কাল তো তুমি শুণ্ডি থেকে ফিরলে। কেমন দেখলে শুণ্ডি?” বলে মন্ত্রী তার দিকে তাকালেন।
-“আজ্ঞে মন্ত্রীমশাই অতুলনীয় রাজ্য, যেদিকে তাকাও শুধু সবুজ আর সবুজ, ফলে ফুলে ভরে আছে চারিদিক, গাছে পাখি গুনগুন করছে, ওখানকার মানুষও খুব শান্ত, চারিধারে নিরিবিলি, কুলকুল করে নদীর জল বয়ে যাচ্ছে।”
রাজা এবার গুপ্তচরের দিকে তাকিয়ে বললেন “ব্যাস ব্যাস, রাখো শুণ্ডির গুনগান। বলো রাজাকে কেমন দেখলে? আর সৈন্যদল?”
-“রাজা সঙ্গীত প্রিয় মানুষ, প্রজারা সময় মত খাজনা দিয়ে যায়। আর সৈন্য নাই।” গুপ্তচর উত্তর দিল।
রাজা এবার খুশি হয়ে হেসে বললেন “সেকি! তাহলে তো হামলা করলেই হাতে রাজ্য।”
-“আজ্ঞে, তবে ওনার দুই জামাতা আছেন, তারা নাকি দেশকে এর আগেও বাঁচিয়েছেন আর আশেপাশের বহু রাজ্যকেই নাকি রক্ষা করতে সাহায্য করেছেন, আর গোপন খবর হলো তাদের কাছে নাকি একজোড়া জুতা আছে। সেই জুতাজোড়া পায়ে পড়ে যেখানে যাবে তার নাম করে হাততালি দিলেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। আর তারা যা গান গাইতে পারেন তা এই আশেপাশের রাজ্য সেইরকম গান কেউ জানে না। আমি শুনেছি সেই গান। একজনের নাম গুপি গায়েন, আরেকজন হলেন বাঘ বায়েন।”
-“সেকি! এরকম আবার হয় নাকি! এমন জুতা হয় নাকি!” রাজা অবাক হয় বললেন।
-“আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! আমি মিথ্যা বললে আমায় শুলে চড়াবেন।”
-“যাক! নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সৈন্য নেই মানে যুদ্ধে জেতা কোনো ব্যাপার নয়, শুধু ওই দুই জামাতাকে বন্দী করতে পারলেই গোটা রাজ্য আমাদের হাতের মুঠোয় মহারাজ” বলে মন্ত্রী খুশি হয়ে রাজার দিকে তাকালেন।
-“তবে সেইরকম জুতা যদি সত্যি হয় সেই জুতা আমার চাইই। এটা মাথায় রেখো মন্ত্রী” বলে রাজা আবার উঠে দাঁড়ালেন।
-“আজ্ঞে তা কি করা যায়?” বলে মন্ত্রী রাজার দিকে তাকালেন।
-“এঃ! এ আবার মন্ত্রী হয়েছে। বলি আমি তোমাকে শুধব না তুমি আমাকে? তা যাইহোক, আমার মাথায় এক ফন্দি এসেছে। সামনেই আমার পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী। মন্ত্রী এক কাজ করো আশেপাশের সব রাজ্যকে নিমন্ত্রণ পাঠাও। লেখ তাঁর পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু রাজ্যদের সঙ্গে পালন করতে চান। আর শুণ্ডিতে তুমি নিজে চলে যাও আর জামাতা দুজনকে নিজে হাতে নিমন্ত্রণ করে এসো। বুঝলে?”
-“আজ্ঞে হুজুর।”
-“যাও যাও, এবার কাজে লেগে পড়তো দেখি! আর ঘুম বন্ধ করে এবার একটু খাটো! যা কুমড়োর মতো হচ্ছো দিনদিন! আর মগনলাল তুমি আরও বেশি করে খবর জোগাড় করতে থাকো।”
-“আজ্ঞে হুজুর” বলে মন্ত্রী ও গুপ্তচর প্রস্থান করলো।
-“হা হা হা! এবার শুণ্ডিকে নিয়েই ছাড়বো হা হা হা” বলে রাজা হাসতে থাকলেন।

২

ভোর হতে এখনো প্রায় অর্ধেক প্রহর বাকি গোটা রাজ্য নিদ্রায় মগ্ন। রাজপ্রাসাদের চারিধারে ও ভেতরে শুধু জনাকয়েক প্রহরী পাহারা দিচ্ছে।

"তোরে করি সাবধান ওরে করি সাবধান, সাবধান সাবধান সাবধান"
"তোরে করি সাবধান ওরে করি সাবধান, সাবধান সাবধান সাবধান"
"তোরে করি সাবধান ওরে করি সাবধান, সাবধান সাবধান সাবধান"

আচমকা ধরমরিয়ে ঘুম থেকে উঠে গুপি বুঝলো সে সপ্ন দেখেছে। কিন্তু স্বপ্নে ভূতের রাজা তাদের সাবধান করছেন কেন? সে তক্ষুনি বিছানা ছেড়ে উঠে পাশে বাঘার ঘরের দিকে এগোলো।
-"বাঘা দা, বাঘা দা! ও বাঘা দা, দরজা খোল এক্ষুনি" দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলো গুপি। সাত আট বার ডাকার পর দরজা খুলে বাঘা সামনে দাঁড়ালো।
-"ভোর তো এখনো অনেক বাকি, হলো কি শুনি?"
-"বাঘা দা, ভূতের রাজা এসেছিলেন|"
-"সেকি! কোথায়? কখন? এখানে কি করে এলেন?"
-"স্বপ্নে এসেছিলেন, বললেন-" তোরে করি সাবধান ওরে করি সাবধান, সাবধান সাবধান সাবধান "
" তোরে করি সাবধান ওরে করি সাবধান, সাবধান সাবধান সাবধান"
" তোরে করি সাবধান ওরে করি সাবধান, সাবধান সাবধান সাবধান ""
-"তোরে করি সাবধান ওরে করি সাবধান, সাবধান সাবধান সাবধান! মানে তোমার সাথে আমাকেও সাবধান বলছেন? ভায়া গুপি, বড়ই চিন্তায় ফেলে দিলে" বলে মনমরা হয় গেল বাঘা।
-"হ্যাঁ, তবে এর মানে কিছু বুঝতে পারলে?"
-"সাবধান মানে কি আমাদের সামনে বিপদ? কে জানে বাবা!"
-"বাঘা দা, আমার বেশ ভয় লাগছে, ঘুমতো আর হবেনা চলো নদীর ধারে গিয়ে সূর্যোদয় দেখি।"
-"হ্যাঁ ঘুমতো হবে না চলো তাই যাই, তুমি যাও জুতাজোড়া নিয়ে এসো, আমি ঢোল নিয়ে আসি। একটু প্রাণ খুলে বাজাবো।"
কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে একসাথে হাতে তালি মেরে "উষা নদীর ধারে" বলতেই পৌঁছে গেল। তখনও নদীর পাড় অন্ধকার। দুজনে নদীর ঘাটে গিয়ে বসলো। একটু বসার পরই পূর্বের আকাশে লাল আভা দেখা দিল। চারিদিকের অন্ধকার আসতে আসতে কাটতে লাগলো, দুজনে মুগ্ধ হয়ে তা দেখতে লাগলো।

ভোরের সূর্য দেখার পর আনন্দের গান

ভূতের রাজা দিল বর
ভূতের রাজা দিল বর
মোদের আগে কি ছিল আর কি ছিল পরে
সবই হলো ভূতের রাজারই বরে
সবই হলো ভূতের রাজারই বরে
ভূতের রাজা দিল জুতা দুই জোড়া
দিলে দুজনাতে তালি, যায় যেখানে খুশি ঘোরা

আ হা...!!
ভূতের রাজা দিল বর খাওয়া আর পড়ার
তাই ভয় নেই খেতে না পেয়ে মরার
ভূতের রাজা দিল সুর এই গলায়
তাতে মোরা রাজারই জামাই
আরে তাতেই মোরা রাজার দুই জামাই
ভূতের রাজা দিল বর
দিল বর

তারা গান থামিয়ে আবার বসলো।

-“আচ্ছা বাঘাদা তোমার কি মনে হয় কিসের ভয় আমাদের?”

-“ধুর ছাতা! আমি কি জেনে বসে আছি? আমার স্বপ্নে এলে তো আমি জেনে নিতুম। ছাড়ো, সে দেখা যাবে’খন। এখন চলো ফেরা যাক অনেক বেলা হয়ে গেল” বলে বাঘা উঠে দাঁড়ালো ।

-“হ্যাঁ চলো” বলে গুপি বাঘা উঠে জুতা পড়ে হাততালি মেরে “রাজপ্রাসাদের ছাদ” বলতেই তারা ছাদে পৌছে গেল মুহুর্তের মধ্যে। এবার তারা ঘরের দিকে ফিরতে যাবে এমন সময় পেয়াদা এসে বলল রাজা মশাই নাকি তাদের খুঁজছেন।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে পেয়াদার সাথে রাজসভায় এসে পৌঁছল।

রাজামশাই ওদের দেখে খুশি হয়ে বললেন “এসো এসো”। তারপর পাশের একজনকে দেখিয়ে বলল “এইযে এরা শুণ্ডির জামাতা, ওই যে ও গুপি আর এ বাঘা। বাবারা ইনি হচ্ছেন আমাদের পাশের রাজ্য মাণিক্যনগরী, সেখানকার মহামন্ত্রী। আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন রাজার ৫০তম জন্মবার্ষিকীতে।”

দুজনে তাকে নমস্কার জানালো, দুজনেই বেশ খুশি। আরেক দেশ দেখতে যাওয়ার খুশিতে সকালের ভয়ের ভাব পুরো কেটে গেল।

বাঘা বলল “মাণিক্যনগরী! বাহ! বেশ খাসা নাম তো! তা আপনাদের ওখানে কি মণি মাণিক্য পাওয়া যায়?”

মাণিক্যর মন্ত্রী বললেন “হ্যাঁ, মণি মুক্তার কারবার আমাদের।”

-“ওহ! তা মুক্তার খনি আছে বুঝি হীরক রাজ্যের হীরের খনির মতো?” বাঘা জানতে চাইলো।

-“মুক্তা পাওয়া যায় সমুদ্রের তলা থেকে। আমাদের সমুদ্রের ধারে রাজ্য তো। আপনাদের আসতেই হবে কিন্তু” বললেন মাণিক্যর মন্ত্রী।

-“হ্যাঁ নিশ্চয় যাবে, এরা যাবে বৈকি” রাজা বললেন।

-“আর আপনাকেও যে যেতে হবে।”

-“না বাবা, আমার বয়স হয়েছে অত ধকল আর সইবে না। শুণ্ডির তরফ থেকে এরা দুজনই যাবে” বললেন রাজা।

-“আচ্ছা, তবে আমায় এবার আজ্ঞা দিন মহারাজ আমি আসি এবার।”

-“সেকি! শুণ্ডি এসেছ, একটু থাকবেনা?”

-“অনেক কাজ পড়ে আছে মাহারাজ। আজ আসি” তারপর গুপি বাঘার দিকে ফিরে বললেন “আর হ্যাঁ, আপনাদের গানের অনেক নাম ডাক শুনেছি। তা সভায় একটি গান যদি গান খুব ভালো হয়।”

-“হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চই গাইবে ওরা” বললেন রাজা।

-“ঠিক আছে” বলে বিদায় নিলেন মাণিক্য রাজ্যের মন্ত্রী।

৩

কিছুদিনের মধ্যেই তারা মাণিক্যনগরীর জন্য রওনা দিলো। মাণিক্যর রাজাই যাতায়াতের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। দুদিন চলার পর মাণিক্যনগরীতে এসে উপস্থিত হলো গুপি বাঘা। রাজ্যের সে কি বাহার। চারিদিকে অপূর্ব সব মূর্তি, স্থাপত্য। ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললো তারা। পথে আরও অনেক অন্য রাজ্যের রাজাদের আসতে দেখা গেল। রাজপথের শোভা দেখে সবার মুখ হাঁ হয়ে গেলো। এবার তারা রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে এক পেল্লায় রাজবাড়ি। যেন ঠিক মুক্তায় মোড়ানো। আর তেমনি সাজানো গোছানো রাজ্য। "সত্যি, এ রাজা আরও অনেকদিন বাঁচুন। এ রাজ্যের আরও প্রতিপত্তি হোক" মনে মনে ভাবল গুপি আর বাঘা। এরপর পেয়াদা তাদের রাজবাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

প্রবেশ পথে অতিথি অভ্যাগতদের স্বাগত করার জন্য মহিলারা গোলাপ জল ছেটালেন। সবাইকে প্রবেশ পথেই কিছু ছোটোখাটো উপহার দেওয়া হলো। এরপর তাদের সাবাইকে প্রথমে নিজের নিজের বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। একটা বিশাল ঘর তাতে পরিপাটি করে দুটো বিছানা গোছানো। সেখানে একটা বিরাট জানলা আছে সেখান দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

-"বাঘা দা, দেখো ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়" গুপি উৎফুল্ল হয়ে বলল।

-"বাহ বাহ, চমৎকার! সুন্দর দৃশ্য। ব্যাবস্থাও মন্দ নয়। মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে গেল হে গুপি ভায়া" বাঘা প্রসন্ন মনে বলল।

-"আচ্ছা বাঘা দা, এইরকম আমাদের রাজ্যেও হলে বেশ হতো না?"

-"না না! আমাদের রাজ্যে কত কি গাছ আছে, ক্ষেত আছে, ফল, ফুল। এখানে আছে সেসব? কিসসু নেই। যতই শোভা হোক না কেন। সবই তো মেকি। আমাদের রাজ্যে সাব খাটি। বুঝলে কিছু?"

-"হ্যাঁ, তা বটে। শুধু খালি জমি আর গাদা গাদা নারকেল গাছ। থাকার মধ্যে ওই এক সমুদ্র।"

-"অনেক হয়েছে এবার একটু আরাম করোতো বাপু।"

-"হ্যাঁ, আমিও একটু বিশ্রাম নিই।"

বলে তারা বিশ্রাম নিতে লাগলো। কিছুপরেই তাদের ভোজন তাদের ঘরে পৌঁছে গেলো। তারা দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেড়ে নিয়ে আরএকটু বিশ্রাম নিল। এমনিতেই এতটা পথের খুব ধকল গেছে। তারা ভাল করে একটু ঘুমিয়েও নিল। এরপর বৈকালিন রাজসভায় তাদের নিয়ে যাওয়া হল। সভার ঠিক মাঝে সিংহাসনে বসে আছেন মাণিক্যরাজা আর তারপাশে বসে রাজ্যের যুবরাজ। একে একে সবার সাথে পরিচয় হবার পর মন্ত্রী মানিক্যের রাজার সাথে গুপি বাঘার পরিচয় করালেন। তারপর রাজা সবাইকে একটি করে মুক্তার মালা উপহার দিলেন।

-"নমস্কার রাজামশাই" গুপি বাঘা দুজনে মাণিক্যর রাজাকে প্রনাম জানালো।

গুপি বাঘার পরিচয় পেয়ে রাজা খুব আহ্লাদিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন "রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয় নি তো?"

-"আজ্ঞে না রাজামশাই, কোনোরকম অসুবিধে হয় নাই আমাদের" বলল গুপি।

-"হ্যাঁ রাজামশাই, আপনার পাঠানো ঘোড়ার গাড়িতে আরামেই এসেছি" বাঘা বলল।

-"বেশ বেশ। তবুও রাস্তার ধকল তো আছেই। তা তোমরা ভালো করে বিশ্রাম নিয়েছ তো?"

-"আজ্ঞে হ্যাঁ রাজামশাই। আমরা এখন পুরো চাঙ্গা।"

-"বাহ! খুব ভালো। তা আমরা কিন্তু তোমাদের গান শুনবো বলে অধীর আগ্রহে বসে আছি। তোমাদের গানের প্রচুর নামডাক শুনেছি।"

-"হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজামশাই সে তো মন্ত্রীমশাই আমাদের আগেই জানিয়েছেন। আমাদের গান বাঁধাও হয়ে গেছে" গুপি উত্তর দিলো।

-"বাঃ সে তো খুব ভালো কথা। তাহলে এখন শোনানো যাবে?"

-"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কোনো ব্যাপার না। এই কে আছো, আমার ঢোলটা নিয়ে এসতো" বাঘা হাঁক পাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে বাঘার পেল্লায় ঢোলটা দিয়ে গেলো।

এবার গুপি মন খুলে গান ধরলো আর বাঘা প্রান খুলে ঢোল বাজালো। এমন গান বাজনা উপস্থিত কেউ কোনোকালে শোনেননি। গান শেষ হওয়া পর্যন্ত গানের গুনে পাথরের মতো বসে রইল। গান শেষ হলে পুরো রাজসভায় ধন্য ধন্য রব উঠল। মাণিক্যর রাজাও যারপরনাই আনন্দিত হয়ে নিজের গলা থেকে দুটি মুক্তার মালা গুপি বাঘার গলায় পরিয়ে দিলেন। এরপর আরও কিছু মনোরঞ্জনের ব্যাবস্থা ছিল। সেসব শেষ হবার পর সভা ভঙ্গ হলো। সবাই আবার নিজের নিজের বিশ্রাম কক্ষের দিকে প্রস্থান করলো।

৪

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে মাণিক্যরাজা এবং মন্ত্রীর গোপন সাক্ষাৎ চলছে।

-"মন্ত্রী ওরা তো এসে গেলো। তা আসল কাজ কখন হবে? কিছু ঠিক করেছ?"

-"আজ্ঞে হ্যাঁ রাজামশাই। লোক ঠিক করা হয়ে গেছে। কাল আপনার জন্মতিথির উৎসব চলবে তখনি কাজ হাসিল করা হবে। জুতা তারপর আমাদের হাতে চলে এলেই এদের আর তেমন কোনো ক্ষমতাও থাকবে না। বলেন তো ওদের দুজনকে বন্দীও করে নিতে পারি" মন্ত্রী জানালেন।

-"না না, বন্দী করতে হবেনা। অতিথিকে বন্দী করলে লোক জানাজানি হলে আমার কোনো সম্মান থাকবে না। তার চেয়ে বরং ওদের যেতে দাও। ওরা চলে যাবার পরের দিনই আমরা শুন্ডি আক্রমণ করবো। উৎসব তো চলবে। কিন্তু তার সাথে যুদ্ধের তৈয়ারিও চালাতে থাকো। যাতে সব অতিথিরা বিদায় নেবার পরেই আমরা যুদ্ধের জন্য রওনা হতে পারি, বুঝলে?"

-"হ্যাঁ রাজামশাই। আর জুতাজোড়া কোষাগারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে এবার আমি যাই? সব তৈরি করতে হবেতো। প্রচুর কাজ, উৎসবের আয়োজনও কিছু বাকি আর যুদ্ধের প্রস্তুতিও নিতে হবেতো।"

-"হ্যাঁ তাই যাও" বলে রাজা আর মন্ত্রী ঘর থেকে বেরোতে যাবেন ঠিক তক্ষুনি দেখলেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যুবরাজ।

রাজা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। ছেলে বেশ আদর্শবাদী। ব্যাবসা, রাজ্যদখল, কূটনীতি এসবের কিছুই বোঝেনা। তার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রজাদের সুরক্ষা, তাদের ভালোমন্দ দেখা এইসব। রাজা বুঝলেন যুবরাজ তাঁর ও মন্ত্রীর পুরো আলোচনাটাই শুনেছেন।

-"এসব কি শুনছি মহারাজ?" বলে যুবরাজ রেগে এগিয়ে এলেন।

-"কেন? কি হয়েছে?" রাজাও বেশ ক্ষেপে গিয়ে বললেন।

-"আপনি শুণ্ডি আক্রমণ করতে চাইছেন? এর মানেটা কি? অতিথি বলে ডেকে এনে সেই দুই জামাইয়ের না থাকার সুযোগ নিয়ে এখন তাদেরি রাজ্য আক্রমণ করবেন? আপনার কি একটুও লজ্জা নেই মাহারাজ? একে তো রাজ্যের প্রজাদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছেন খাজনার বোঝায়।"

-"আমি তোমার সাথে এবিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইনা। মন্ত্রী, তুমি এখন আসতে পারো" বলে মন্ত্রীকে বিদায় দিতে গেলেন রাজা।

-"না মন্ত্রীমশাই। আপনি যাবেননা। এ হতে পারেনা। আমি থাকতে এতবড় অন্যায় মেনে নেবনা।"

-"মানেটা কি? তুমি জানোনা রাজ্যের কোষাগারের কি দুরবস্থা? আমাদের কাছে এছাড়া কোনো উপায় নেই৷ শুণ্ডি আমাদের দখল করতেই হবে৷"

-"না এটা কোনো সমাধান নয়৷ এ আমি হতে দেবো না কিছুতেই৷ আমি এক্ষুনি ওদের দুজনকে গিয়ে সাবধান করে দেবো৷" এই বলে যুবরাজ বেরিয়ে গেলেন৷

-"উফ্‌ফ! এই ছেলেকে নিয়ে পারা যায় না৷ মন্ত্রী যাও ওকে আটকাও৷ না দাঁড়াও, ওকে বন্দী করে কারাগারে পোরো৷ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাক ও৷"

-"কি বলছেন রাজামশাই?" মন্ত্রী ভীত হয়ে বললেন৷

-"হ্যাঁ, যা বলছি তাই করো৷ আর যা ঠিক হয়েছে সেইমতো কাজ চালাও৷ যাও৷"

মন্ত্রী চলে গেলেন৷ একটু পরেই গুপি বাঘার ঘরের একটু দূরেই যুবরাজকে ধরা হল৷ পেয়াদা যুবরাজকে নিয়ে কারাগারে নিয়ে গেল৷

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল রাজ্য জুড়ে তোড়জোড়৷ একটু পরেই শুরু হবে রাজার জন্মদিনের উৎসব৷ আজ রাজ্যে সাবাই খুব খুশি৷ এতো বিদেশী অতিথি একসাথে আগে কখনো আসেনি রাজ্যে৷ রাজার মনও খুব ভালো৷ আজকেই জুতাজোড়া হাত করা যাবে৷

কেউ কেউ অবশ্য যুবরাজের আনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে৷ কিন্তু সে "রাজ্যের বিশেষ কাজে যুবরাজকে বাইরে যেতে হয়েছে" এই অজুহাতে সামলে নেওয়া গেছে৷ গুপি বাঘাও আজ বেশ খুশি৷ অনেক দিন পর নতুন রাজ্য দেখা হলো৷ রাজার এতো আপ্যায়ন তাদের খুব মনে ধরেছে৷

একে একে সব অতিথিরা চলে এলেন৷ একটু পরেই শুরু হলো উৎসব৷ প্রথমে শুরু হলো উপহার দেবার পর্ব৷ সব রাজারা নিজেদের রাজ্যের বিশেষ বিশেষ জিনিস রাজাকে উপহার দিলেন৷ গুপি বাঘাও শুণ্ডির তরফ থেকে দুটি সোনার আংটি উপহার দিলো রাজাকে৷ তারপর শুরু হল মনোরাঞ্জন পর্ব৷ সে কত আয়োজন৷ সঙ্গীত, নৃত্য, জাদু আরও কত কি৷ গুপি বাঘাও রাজার বিশেষ অনুরধে গান শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করলো৷ সবশেষে খাওয়া দাওয়া৷ সেও এক এলাহি ব্যাপার৷ সারাদিন মহানন্দে কেটে গেল৷

ওদিকে রাজপ্রাসাদের বিশ্রামকক্ষের এক কোনে রাখা ভূতের রাজার দেওয়া গুপি বাঘার জুতাজোড়া সরিয়ে নিল রাজা আর মন্ত্রীর এক বিশ্বস্ত লোক৷ আসল জুতাজোড়া সরিয়ে রাখা হোলো একইরকম দেখতে নকল একজোড়া জুতা৷ কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না৷

৫

-"কি মন্ত্রী, কাজ হয়েছে?" রাজা জানতে চাইলেন৷

-"হ্যাঁ হুজুর, কাল যখন আপনারা রাজসভায় আনন্দ করছিলেন তখনি আমি লোক দিয়ে জুতাজোড়া সরিয়ে নিয়েছি" গর্ব করে বললেন মন্ত্রী৷

-"হা, হা, হা৷ বাঃ মন্ত্রী, বাঃ! আমি তোমার কাজে খুব খুশি, এবার বলো তো ওই দুই আপদ বিদায় নিচ্ছে কখন?"

-"ওরা আজ একবার সবার সাথেই আপনার সঙ্গে দেখা করবে, এরপর ওদের বিশেষ ইচ্ছে মুক্তাখানায় মুক্তা তৈরি দেখবে আর তারপর মধ্যান্নভোজ করে ওরা ফিরে যাবে মাহারাজ"

-"ঠিক আছে"

এর মধ্যে পেয়াদা এসে খবর দিল সব অতিথিরা আসছেন৷ রাজা সিংহাসনে গিয়ে বসলেন৷ সবাই রাজার অতিথি আপ্যায়ন এবং উৎসব দেখে খুব খুশি৷ রাজাকে সবাই বিদায় জানাতে এসেছেন৷ গুপি বাঘাও এসেছে৷ তবে তারা অবশ্য এখনি চলে যাবেনা৷ মুক্তাখানা দেখে তবে যাবে৷

সবাই বিদায় নেওয়ার পর গুপি বাঘা রাজার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো৷

-"রাজা মশাই৷ যা আনন্দ হল এতদিন কি বলব!" গুপি খুব আনন্দের সাথে জানালো৷

-"হ্যাঁ রাজামশাই, গুপি ঠিকই বলেছে৷ আপনার এতো আদরযত্ন আমাদের খুব ভালো লেগেছে রাজামশাই৷"

-"হে হে, যাক তোমাদের সবার ভালো লেগেছে শুনেই আমার ভালো লাগছে৷ আর কাল বড়ই মধুর গান শোনালে তোমরা আমি খুব খুশি৷ তা তোমরা থাকছ তো?" বললেন রাজা

-"না না, আমরা আজই মুক্তা তৈরি দেখে বিকেলে বিদায় নেব"

-"সেকি! এতো তাড়াতাড়ি! ঠিক আছে সাবধানে যেও৷ মন্ত্রী তুমি নিজে গিয়ে এদের মুক্তাখানা দেখিয়ে দিও" রাজা বললেন৷

- "আজ্ঞে মহারাজ" মন্ত্রী বললেন৷

মন্ত্রী গুপি বাঘাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তারা সমুদ্র ধার দিয়ে যাচ্ছিল৷

-"বাঃ, দেখো ভায়া গুপি সমুদ্র হাওয়া কতই মধুর"

-"যা বলেছ বাঘা দা, বড়ই মধুর৷"

-"ওই যে ঘর দেখছেন ওখানেই আমাদের কাজ হয়৷ নৌকা করে মুক্তা আসে৷ ওই যে ওখানে মুক্তা বার করে পরিস্কার করে কারখানায় যায়৷ সেখানেই নানারকম জিনিস তৈরি হয় এই যেমন মুক্তার হার, চুড়ি এইসব৷ সেই মুক্তা বেচেই আমাদের রাজ্যের আমদানি৷" মন্ত্রী জানালেন৷

-"ও আচ্ছা" বলল দুজনে৷

সবাই ঘোড়া থেকে নামল, মন্ত্রী একটি জিনিস নিয়ে তাদের দেখালেন, যেটা আনলেন সেটা দুটি ঝিনুক জোড়ার মত দেখতে, "এই দেখো সমুদ্র থেকে এইটা পাওয়া যায়, এখানে এনে সেটা খুলে মুক্তা বার করে পরিস্কার করা হয়" বললেন মন্ত্রী

-"বাবা! এত ভাবাই যায় না" গুপি হা করে দেখতে লাগলো

-"সত্যি! ভাবা বড়ই কঠিন" বলল বাঘা৷

-"ভেতরে আসুন এই দেখুন এত পুরুষ, মহিলা একসাথে কাজ করছেন" মন্ত্রী দুজনকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন৷

-"ওরে বাবা! এযে না দেখলে ভাবাই যায় না এত্ত মুক্তা" বাঘা অবাক হয় দেখতে লাগলো

-"এদিকে আসুন, এই দেখুন নীল মুক্তা, লাল৷ এইটা দেখুন গোলাপী মুক্তা, সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য ও সবচেয়ে দামী'

-"আচ্ছা! আমাদের রাজা যে হার দিলেন তাতে তো এই মুক্তাই আছে, মন্ত্রীমশাই?"

-"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন"

গুপি বাঘা সব দেখে রাজপ্রাসাদে ফিরে দুপুরের আহার সেরে বিশ্রাম করে শুণ্ডির উদ্দেশ্যে রওনা হলো৷

কিছুটা দূর যাওয়ার পরই বাঘা বলল "গুপি এভাবে যেতে গেলে তো সারা রাত লেগে যাবে তার চেয়ে জুতা পরে গেলে হয় না, ঘোরার গাড়ি এখানেই ছেড়ে দিই, কি বল?"

-"তা ঠিক বলেছ, দাঁড়াও সারথী, এখানেই গাড়ি থামাও৷ আমরা এবার নিজেই চলে যাব৷"

তারা নেমে মাণিক্য রাজ্যের গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিল৷ গাড়ি কিছুদূর যেতেই তারা জুতা বার করে পড়ে নিল৷ তারপর হাতে হাতে তালি দিয়ে জোরে বলে উঠলো "শুণ্ডি", কিন্তু কিছুই ফল হলনা দেখে ওরা জুতা আবার আরো ভালো করে পড়ে বলল "শুণ্ডি", "শুণ্ডি", "শুণ্ডি", "শুণ্ডি"৷ কিন্তু কিছুই হলনা ওরা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল৷

-"একি বাঘা দা, জুতা তো আজ কাজ করছে না, এদিকে গাড়িও তো চলে গেল।"

-"তাই তো দেখছি। আচ্ছা আরেক বার তালি মারি তো চলো" বলে ওরা আবার "শুণ্ডি" বলে তালি মারল। কিন্তু না, এবারেও কিছু হলনা।

-"কিন্তু বাঘা দা, জুতা কাজ করছেনা কেন?"

-"তা আমি কেমন করে জানব?"

ওরা দুজন হতাশ হয়ে ওখানেই বসে পড়ল। বসে বসে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। কিন্তু কিছুই মাথায় আসছে না। আর এই রাতে একা একা এতটা পথ হেঁটে ফেরারও কোনো মানে হয়না। পথে অনেক রকম বিপদ হতে পারে। গুপি মনে মনে এসব ভাবতে লাগলো।

-"বাঘা দা জঙ্গলে বাঘ আছে?" গুপি ভয় ভয় জানতে চাইল।

-"তা জঙ্গল যখন বাঘ, সাপ খোপ,হাতি পেঁচা বেজি সবই থাকবে, তবে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই যতটা পারা যায় এগোনো যাক।"

-"কিন্তু এতো রাতে তো কিছু ঠাওর করা যাবে না।"

-"আচ্ছা, তাহলে বরং আজ রাতটা এখানেই বিশ্রাম নেওয়া যাক। কাল শুণ্ডি ফিরে দেখা যাবে কি করা যায়। ভূতের রাজার কাছে একবার যেতে পারলে ভালো হয়। যাইহোক এখন তো শুয়ে পড়ি চলো।"

-"হ্যাঁ, এটাই ঠিক বলেছ বাঘা দা। তাই করি। কালকেই দেখা যাবে। এখন বিশ্রাম নিই।" এই ভেবে গুপি আর বাঘা দুজন কাছাকাছি একটা গাছের তলায় বসে পড়লো।

-"আচ্ছা তাহলে কিছু খাবার আনিয়ে খাই নাকি?"

-"নাহে গুপি ভাই, আজ আর খেতে মন নাই। মন বড়ই খারাপ জুতাজোড়ার জন্য।"

-"তা বললে তো হবে না। এস অল্প খেয়ে এখানে বিশ্রাম নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই"

তারা টিলার উপর অল্প খেয়ে রাতটা কাটাবে বলে ঠিক করে বিশ্রাম করতে লাগলো......

ওদিকে রাজপ্রাসাদের কারাগারে যুবরাজ ছটফট করছেন। এতক্ষনে কি কি হয়ে গেছে কে জানে। শুণ্ডি হয়ত এখনো আক্রমণ করেননি মাহারাজ কিন্তু গুপি গায়েন আর বাঘা বায়েন! ওঁরা কোথায় আছেন কে জানে? এইসব সাতপাঁচ ভাবছিলেন যুবরাজ।

"যুবরাজ, যুবরাজ!" হঠাৎ কে যেন ডাকল।

-"কে? কে ডাকছে?"

-"আমি মহাবীর মহারাজ।"

-"ওঃ মহাবীর! তুমি! তুমি এখানে কি করে এলে? জানলে কি করে যে এখানে আমি আছি?"

মহাবীর যুবরাজের একমাত্র বিশ্বস্ত লোক। মহাবীর উত্তর দিলো "যুবরাজ আমি গোপন সুত্রে জেনেছি আপনাকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। আমি জানি আপনি কোনো কিছু ভুল করতে পারেননা তাই চলে এলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

-"খুব ভালো কাজ করেছ। এখুনি আমাকে বের করো এখান থেকে। আর তুমি কি জানো শুণ্ডির দুই জামাতা কোথায় এখন?"

-"হ্যাঁ যুবরাজ তাঁরা রওনা দিয়ে দিয়েছেন। তবে কেন যেন ওঁরা মাঝপথেই গাড়ি ফেরত পাঠিয়েছেন। বোধহয়ে অন্য ব্যাবস্থা আছে। ওদিকে কিন্তু রাজামশাই শুণ্ডিতে দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধের সংবাদ দিয়ে।"

-"সেকি! তাহলে তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে। মহাবীর তুমি এখুনি দুটো আমার ঘোড়া তৈরি করো। আর তারসাথে আরো দুটো ঘোড়া।"

-“কিন্তু কেন যুবরাজ?”

-“সে অনেক কথা। তোমাকে পরে বলব। আগে যা বলছি সেটা করো। আমরা আর দেরি করতে পারব না। নিশ্চয়ই ওঁরা জুতার কথা ভেবে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু জুতা তো আছে কোষাগারে। ওঁরা ফিরতেও পারবেন না শুণ্ডি। এর মধ্যে শুণ্ডি আক্রমণ হলে শুণ্ডির হার নিশ্চিত। তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও মহাবীর।”

-“ঠিক আছে যুবরাজ।” বলে মহাবীর চলে গেল।

৬

ঘুটঘুটে অন্ধকার জঙ্গলে টিলার নিচে কয়েকটি গাছের মধ্যে একটা কেমন যেন আলো জ্বলছে আর নিভছে। দুজনে সেই আলো অনুসরণ করে আলোর সামনে এলো। অবাক হয়ে দেখল ভূতের রাজা এসেছেন। তাদের বলছেন ...

কথা খানি শোন মন দিয়া।
জুতা রাখা আছে আয় নিয়া।।
মানিক রাজ্যের কোষাগারে,
জুতা জোড়া আছে পরে।।
ভোর হলে যা চলে
জুতা জোড়া আয় নিয়ে।
রাজা ভারী দুষ্টু
না হলে আরো বিপদ..
না হলে আরো বিপদ..
না হলে আরো বিপদ..

আসতে আসতে আলো মিলিয়ে যেতে লাগলো দুজন দাঁড়িয়ে রয়ে গেল।

হঠাৎ ওরা দুজনেই ধরমরিয়ে ঘুম থেকে উঠে বসলো তখন ভোরের আলো উঠেছে। দুজনে একে অপরের দিকে তাকাল। এবার গুপি বলল “ভূতের রাজা এসেছিলেন।”

-“হ্যাঁ, আমিও দেখলাম” বলল বাঘা।

-“কি বললেন?”

-“বললেন জুতাজোড়া মাণিক্যর রাজপ্রাসাদে রাখা আছে। নিয়ে আসতে। না হলে আরো বিপদ।”

-“তাহলে কি করবে বাঘা দা? মাণিক্যতে ফিরে যাবে?”

-“হ্যাঁ যেতে তো হবে। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের জুতাজোড়া ওখানে কেন?”

-“সে যাই হোক, যেভাবেই হোক সেই কোষাগার থেকে জুতাজোড়া আনতেই হবে, নাহলে কি হবে শুনলেই তো।”

-“হ্যাঁ, এই জন্যই সেদিন ভূতের রাজা বলেছিল সাবধান।”

-“হুম, গুপি এই মাণিক্যরাজা বদমাইস রাজা, ওই নিশ্চয়ই ওই লোকটাই জুতাজোড়া লুকিয়ে নকল জুতা রেখেছে”

-“হ্যাঁ ঠিক বলেছ।”

-“চলো মাণিক্য রাজ্যের উদ্দশ্যে এখনি বেরই”

কিছুদুর এগোবার পড়ি একটি ঘোড়ার গাড়ির শব্দে তারা থামল। এদিক ওদিক তাকাতেই দেখল একটি ঘোড়ার গাড়ি তাদের দিকে আসছে। কাছে আসার পর বোঝা গেল যে গাড়ি শুন্ডি থেকেই আসছে।

-"আরে আপনারা! আমি তো আপনাদেরই খুঁজতে যাচ্ছিলাম" বলল গাড়ির পেছনে বসে থাকা শুন্ডির মন্ত্রী।

-"আরে আপনি? আপনি এখানে কেন? আর আমাদের কেন খুঁজছিলেন?" বলল গুপি।

-"সেকি! আপনারা জানেন না? আপনারা এখানে আসার পরপরই মাণিক্য রাজ্য থেকে দূত গেছিল শুন্ডিতে। আর যুদ্ধের পত্র রাজার হাতে ধরিয়ে এসেছে। আমরা তো ভাবলাম আপনাদের বোধয়ে বন্দী করা হয়েছে" বলল মন্ত্রী।

-"সেকি আমাদের নিমন্ত্রণ করে জুতা চুরি করলো আর এদিকে শুন্ডি আক্রমণ করছে? মহাবদমাইশ তো" বলল গুপি।

-"তুমি এক কাজ করো মন্ত্রী, তুমি শুন্ডি ফিরে যাও। গিয়ে রাজামশাই কে বল আমরা ভালো আছি আর আমরা শিঘ্রই শুন্ডি ফিরছি" বলল বাঘা

-"আমি আপনাদের না নিয়ে কি ভাবে ফিরি?" বলল মন্ত্রী

-"তুমি যাও মন্ত্রী আমরা বলছিতো" বলল বাঘা।

মন্ত্রী ঘোরা নিয়ে চলে গেল। গুপি বাঘা এগোতে লাগলো। কিছুদূর এগোনোর পরেই আবার ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া গেলো। এখন আবার কে আসছে এদিকে? মাণিক্যরাজার লোক নয়তো? একটু পরেই দেখা গেলো মাণিক্যর যুবরাজ এদিকেই আসছেন। তাঁর সাথে আরও দুটো ঘোড়া। তাঁকে দেখে গুপি বাঘা দাঁড়িয়ে পড়লো।

যুবরাজ কাছাকাছি আসতেই গুপি বাঘাকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

-"একি আপনি? আপনিতো রাজ্যে ছিলেননা" বাঘা জানতে চাইল।

-"আসলে আমি রাজ্যেই ছিলাম। আমি শুণ্ডির উপর আক্রমণ আর আপনাদের জুতা চুরির খবর জানতে পেড়ে যাই। আমি আপনাদের সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম বলে মহারাজ আমাকে এতদিন কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।" বললেন যুবরাজ।

-"সেকি! নিজের ছেলেকে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন?"

-"হ্যাঁ, আসলে বাবা ওইরকমই। লোভে অন্ধ হয়ে যান। কে আপন কে পর কিছুই তখন মনে থাকে না ওনার। সে যাই হোক। আপনারা নিশ্চয়ই মাণিক্যতেই যাচ্ছিলেন। আপনাদের জুতা তো ওখানেই আছে, কোষাগারে। আমি এই সবে কারাগার থেকে এক বন্ধুর সাহায্যে বেরতে পেড়েছি। আপনাদের যাওয়ার জন্য সঙ্গে দুটি ঘোড়াও এনেছি।"

-"অনেক ধন্যবাদ। বড় উপকার করলেন আপনি আমাদের। চলুন এখুনি যাওয়া যাক" এই বলে গুপি বাঘা ঘোড়ায় চড়ে মাণিক্যর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

কিছুদূর যাবার পরেই বহু ঘোরা ও সৈন্য দলের আওয়াজ পেয়ে একটি বড় গাছের পেছনে তারা লুকোলো। তারা দেখল বিশাল এক সৈন্যদল তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একদম সামনে বিশাল একটা রথ তাতে বসে আছে মাণিক্যর রাজা তাদের বুঝতে বাকি রইলো না এই সৈন্য শুন্ডি আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

-"আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে, বোঝাই যাচ্ছে এরা শুন্ডির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে, সুতরাং আমাদের শিঘ্রই জুতা জোড়া নিয়ে শুন্ডি ফিরতে হবে" যুবরাজকে উদ্দেশ্য করে বলল বাঘা।

-"হ্যাঁ বাঘা দা চলো আমরা তারাতারি যাই" বলল গুপি।

সন্ধে নামবার কিছু পূর্বেই তিনজনে রাজবাড়ির কাছে পৌছল। প্রথমেই তারা গেল গোয়ালঘরে সেখানে গিয়ে খর দিয়ে বেশ কিছু দাড়ি বানালো। যুবরাজও তাদের সাহায্য করলেন। এবার তারা চুপি চুপি অন্ধকার দিয়ে রাজবাড়ি প্রবেশ করলো। যুবরাজের বিপদ হতে পারে বলে তাঁকে সঙ্গে না নিয়েই এগিয়ে গেলো গুপি বাঘা। যুবরাজ তাদের কোষাগারের সন্ধান দিয়ে দিয়েছেন। সৈন্য কম থাকায় একদিকে তাদের সুবিধাই হলো। তারা দোতলায় উঠতে যাবে এমন সময় দুটো সৈন্য তাদের দিকে এগিয়ে আসতেই গুপি গান ধরল। অমনি তারা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে

সঙ্গে বাঘা দড়ি দিয়ে তাদের বেঁধে দিল। এরপর দুজনে খাজনা ঘরের দিকে এগোতে লাগলো। গিয়ে দেখল খাজনা ঘরের সামনেও দুজন পেল্লাই লোক চাবি নিয়ে বসে আছে। এখানেও তারা গানের সাহায্য নিয়ে তাদের বেঁধে চাবি হাতিয়ে নিলো। তারা চাবি খুলে ভেতরে গিয়ে অবাক হয় গেল। চারি ধারে শুধু ঘর ভর্তি করে মুক্তা ঠাসা। আর এক কোণে একটি আলোর নিচে একটি বিশাল লোহার বাক্স। তার পাশেই চাবি দেখে গুপি মহানন্দে চাবি নিয়ে লোহার বাক্সটি খুলতে লাগলো। গুপি বাক্সের ঢাকনা খুলে যা দেখল তাতে দু চোখ ছানাবড়া হয় গেল। ওর মুখ দিয়ে একটাই কথা বেরোলো.... "সা---সা ---সা---সা--সাসাসাসাসাসাসা ....."

-"কি যে সা সা করছ" বলে বাঘা এগিয়ে গেল বাক্সের দিকে। তাকিয়ে দেখল তাদের জুতাজোড়া একটা মিশমিশে কালো কেউটে সাপ জড়িয়ে বসে আছে।

-"সাপ কি গান শোনে বাঘা দা?"

-"সামনেই তো আছে জিজ্ঞেস করে দেখো'খন"

গুপি একটু গান গাইলো, কিন্তু তাতে কিছুই হল না। তখন গুপির মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

-"এক কাজ করি বাঘা দা, চলো আমরা কলা দুধ আনাই।"

-"হ্যাঁ, তাই করি" বলে তালি মেরে তারা কলা ও দুধ আনলো।

তারা সেই এক বাটি দুধ কলা বাক্সের একটি কোনে রাখতেই সাপটি জুতা ছেড়ে চলে গেল সেই বাটির দিকে। সেই সুযোগে গুপি জুতা আস্তে আস্তে বার করে বাক্স বন্ধ করে হাপ ছেড়ে বাঁচলো।

জুতা জোড়া পেয়ে তারা ভীষন খুশি। তারা সঙ্গে সঙ্গে জুতা পায়ে দিয়ে শুন্ডি বলে চেঁচিয়ে উঠল আর মুহুর্তের মধ্যেই শুণ্ডিতে তাদের ঘরে পৌছে গেল।

সেখানে পৌঁছেই তারা রাজার ঘরে গেল। রাজা তো তাদের দেখে বেজায় খুশি তাদের জড়িয়ে ধরে রাজা বললেন "তোমরা এসে গেছ, আমি বড়ই আনন্দিত। আর আমার চিন্তা নেই, আমি তো ভাবলাম আমি রাজ্য খুইয়েই দেব।"

-"না রাজা মশাই আমরা থাকতে শুন্ডি আমরা হাতছাড়া হতে কোনো মতেই দেবনা। আমরা ওই সৈন্য দেখে এসেছি। আসুক কাল সকালে ওরা। ওদের দেখে নেব" বলল গুপি আর বাঘা।

৭

সে রাতে কারও আর ঘুম হলনা শুণ্ডির রাজবাড়িতে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা, কাল সকালের অপেক্ষায় সবাই বসে আছে।

সকাল হতেই গুপি বাঘা তৈরি হয়ে পড়লো। মাণিক্যর সৈন্য বোধহয়ে এতক্ষণে শুণ্ডির বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছোতে হবে। গুপি বাঘা বেরিয়ে পড়লো।

কিছুদূর যেতেই তারা দেখতে পেল দূর থেকে শুণ্ডির সীমানার একটু দূরেই। তারা হাতে হাতে তালি মেরে সৈন্য দলের একটু দূরে আড়ালে এসে দাঁড়ালো। বিশাল সৈন্য দল। আগেরবার রাত ছিল বলে এই আয়তন বোঝা যায়নি। তার উপর কত অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে। এই নিয়ে শুণ্ডি আক্রমণ করলে শুণ্ডির কিছুই করার থাকত না। গুপি বাঘাও হয়তো কিছু করতে পারতো না। তারা মনে মনে মাণিক্যর যুবরাজ আর ভূতের রাজাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানালো।

এবার গুপি গান ধরল। সেই গান শুনে সাবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। কেউ নড়েও না চড়েও না। গুপি বাঘা ধীরে ধীরে রাজার কাছে এগিয়ে গেলো। এবার রাজার সামনে গিয়ে তারা রাজাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। এবার তারা হাতে তালি মেরে রাজাকে ধরে নিয়ে শুণ্ডির রাজার সামনে হাজির করলেন। মানিক্য রাজা তো হতবাক! কি হলো কিছুই বুঝতে পারছেন না। গুপি বাঘা শুণ্ডির রাজাকে বললো "মহারাজ, এই যে আপনার দোষী। এবার এর বিচার করুন।"

শুন্ডির রাজা প্রথমে একটু হতবাক হয়ে গেছিলেন। তারপর বুঝলেন এই সেই মাণিক্যর রাজা যে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে চেয়েছিল। রাজা একটু মুচকি হেসে বললেন "আমি আর কি বিচার করবো বলো? আমি তো এসব হিংসার মধ্যে একেবারেই যাওয়া পছন্দ করিনা। তোমরা এঁকে ছেড়েই দাও।"

-"কিন্তু রাজামশাই এঁকে ছেড়ে দিলে যদি এ আবার আক্রমণ করতে চায় তাহলে? প্রতিবার তো আমরা জানতে পারব না আগে থেকে" গুপি বললো।

-"তাহলে তোমরাই ঠিক করে বলো কি করা যায়?"

-"রাজামশাই মাণিক্যর যুবরাজ বড়ই ভালো আর দয়ালুও। ওঁর মদতেই আমরা আমাদের জুতাজোড়া ফেরত পেয়েছি আর এতো তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছতে পেরেছি। মহারাজ আমি ভাবছিলাম যদি ওঁকেই মাণিক্যর সিংহাসনে বসানো হয় খুব ভালো হয়। ওদের রাজ্যও আরও সমৃদ্ধ হবে। আমাদেরও কোনো ভয় থাকবেনা। আর এঁকে নাহয় ছেড়েই দেওয়া হলো।"

-"এতো অতি উত্তম প্রস্তাব! তাহলে আজই এঁকে সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাও এবং যা কাজ আছে সেরে নাও।"

-এবার মাণিক্যর রাজা বললেন "আমি খুবই লজ্জিত মহারাজ। এমনিতেও আমার ছেলে আমার থেকে ঢের বেশী ভালো। আর প্রজাদেরও সে খুব প্রিয়। আপনাদের এই সিদ্ধান্ত আমি মাথা পেতে নিলাম।"

এরপর গুপি বাঘা সসম্মানে মাণিক্য রাজাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে গেলো। সেখানে যুবরাজের রাজ্যাভিষেক হলো। মাণিক্য আর শুন্ডি দুই রাজ্যের প্রজা আজ খুব খুশি। দুই রাজ্য উৎসবে মেতে উঠলো। সবাই খুব খুশি। আর গুপি বাঘা মনে মনে ভূতের রাজাকে আরও একবার অনেক ধন্যবাদ দিলো।

সমাপ্ত

কবিতা

রতনের প্রেম

সোমা মজুমদার

কাঁদিয়ে তাকে চলে গেলে
হাজার যোজন পার,
আজও সে দাঁড়িয়ে একা
খুলে হিয়ার দ্বার;

যাবার সময় পড়েনি চোখে
নয়ন ভরা জল,
এক ছুটে সে পালিয়ে গেল
আঁখি ছলছল;

আজও তার কানে বাজে
পোস্ট মাস্টারের ডাক,
রতন তুই যাসনা চলে
একটু খানি থাক;

ছোট্ট চোখে স্বপ্ন ছিল
শহর যাবে বলে,
ফিরে গেলে তোমার ঘরে
একলা তারে ফেলে;

আশে পাশে অনেক রতন
আজও বেঁচে আছে,
ভালবাসা দেয়নি ধরা
হারিয়ে কোথায় গেছে।।

১৪২১ বৈশাখ

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
	15 Apr ১ পূর্ণিমা	16 ২	17 ৩	18 ৪	19 ৫	20 ৬
21 ৭	22 ৮	23 ৯	24 ১০	25 ১১ একাদশী	26 ১২	27 ১৩
28 ১৪	29 ১৫ অমাবস্যা	30 ১৬	1 May ১৭	2 ১৮ অক্ষয়তৃতীয়া	3 ১৯	4 ২০
5 ২১	6 ২২	7 ২৩	8 ২৪	9 ২৫ রবীন্দ্রজয়ন্তী	10 ২৬ একাদশী	11 ২৭
12 ২৮	13 ২৯	14 ৩০ বুদ্ধপূর্ণিমা	15 ৩১			

১৪২১ জ্যৈষ্ঠ

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
15	16	17		May16 ১	17 ২	18 ৩
19 ৪	20 ৫	21 ৬	22 ৭	23 ৮	24 ৯ একাদশী	25 ১০
26 ১১	27 ১২ শবেমিরাজ	28 ১৩ অমাবস্যা	29 ১৪	30 ১৫	31 ১৬	1 Jun ১৭
2 ১৮	3 ১৯ লোকনাথ তিরো	4 ২০ জামাইষষ্ঠী	5 ২১	6 ২২	7 ২৩	8 ২৪ দশহরা
9 ২৫ একাদশী	10 ২৬	11 ২৭	12 ২৮	13 ২৯ পূর্ণিমা	14 ৩০ সবেবরাত	15 ৩১

১৪২১ আষাঢ়

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
16 Jun ১	17 ২	18 ৩	19 ৪	20 ৫	21 ৬	22 ৭
23 ৮ একাদশী	24 ৯	25 ১০	26 ১১	27 ১২ অমাবস্যা	28 ১৩	29 ১৪ রথযাত্রা
30 ১৫	1 Jul ১৬	2 ১৭	3 ১৮	4 ১৯	5 ২০	6 ২১
7 ২২	8 ২৩ একাদশী	9 ২৪	10 ২৫	11 ২৬	12 ২৭ গুরুপূর্ণিমা	13 ২৮
14 ২৯	15 ৩০	16 ৩১ নাগপঞ্চমী	17 ৩২			

১৪২১ শ্রাবণ

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
				Jul18 ১	19 ২	20 ৩
21 ৪	22 ৫ একাদশী	23 ৬	24 ৭	25 ৮ জুম্মাৎ-উল-বিদা	26 ৯ অমাবস্যা শাবিকদর	27 ১০
28 ১১	29 ১২ ইদলফেত্তর	30 ১৩	31 ১৪	1 Aug ১৫	2 ১৬	3 ১৭
4 ১৮	5 ১৯	6 ২০ ঝুলনযাত্রা	7 ২১ একাদশী	8 ২২	9 ২৩	10 ২৪ পূর্ণিমা
11 ২৫	12 ২৬	13 ২৭	14 ২৮	15 ২৯	16 ৩০	17 ৩১ জামাইষষ্ঠী

১৪২১ ভাদ্র

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
Aug 18 ১	19 ২	20 ৩	21 ৪ একাদশী	22 ৫	23 ৬	24 ৭
25 ৮ অমাবস্যা	26 ৯	27 ১০	28 ১১	29 ১২ গনেশ পূজা	30 ১৩	31 ১৪
1 Sep ১৫	2 ১৬	3 ১৭	4 ১৮	5 ১৯ একাদশী	6 ২০	7 ২১
8 ২২	9 ২৩ পূর্ণিমা	10 ২৪	11 ২৫	12 ২৬	13 ২৭	14 ২৮
15 ২৯	16 ৩০	17 ৩১ বিশ্বকর্মাপূজা				

১৪২১ আশ্বিন

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
			Sep 18 ১	19 ২ একাদশী	20 ৩	21 ৪
22 ৫	23 ৬ মহালয়া	24 ৭ অমাবস্যা	25 ৮	26 ৯	27 ১০	28 ১১
29 ১২ দুর্গাষষ্ঠী	30 ১৩ মহাসপ্তমী	1 Oct ১৪ মহাষ্টমী	2 ১৫ মহানবমী	3 ১৬ বিজয়া দশমী	4 ১৭ একাদশী	5 ১৮
6 ১৯ ইদুজ্জোহা	7 ২০ লক্ষীপূজা	8 ২১ পূর্ণিমা	9 ২২	10 ২৩	11 ২৪	12 ২৫
13 ২৬	14 ২৭	15 ২৮	16 ২৯	17 ৩০	18 ৩১	

১৪২১ কার্ত্তিক

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
17 ৩০ কার্ত্তিকপূজা						Oct 19 ১ একাদশী
20 ২	21 ৩ ধনতেরাস	22 ৪	23 ৫ অমাবস্যা শ্যামাপূজা	24 ৬	25 ৭ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	26 ৮
27 ৯	28 ১০	29 ১১ ছটপূজা	30 ১২	31 ১৩	1 Nov ১৪ জগদ্ধাত্রীপূজা	2 ১৫
3 ১৬ একাদশী	4 ১৭	5 ১৮	6 ১৯ পূর্ণিমা	7 ২০	8 ২১	9 ২২
10 ২৩	11 ২৪	12 ২৫	13 ২৬	14 ২৭	15 ২৮	16 ২৯

১৪২১ অগ্রহায়ণ

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
	18 Nov ১ একাদশী	19 ২	20 ৩	21 ৪	22 ৫ অমাবস্যা	23 ৬
24 ৭	25 ৮	26 ৯	27 ১০	28 ১১	29 ১২	30 ১৩
1 Dec ১৪	2 ১৫ একাদশী	3 ১৬	4 ১৭	5 ১৮	6 ১৯ পূর্ণিমা	7 ২০
8 ২১	9 ২২	10 ২৩	11 ২৪	12 ২৫	13 ২৬	14 ২৭
15 ২৮	16 ২৯					

১৪২১ পৌষ

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
		Dec 17 ১	18 ২ একাদশী	19 ৩	20 ৪	21 ৫
22 ৬ অমাবস্যা	23 ৭	24 ৮	25 ৯	26 ১০	27 ১১	28 ১২
29 ১৩	30 ১৪	31 ১৫	Jan 1 ১৬ একাদশী	2 ১৭	3 ১৮	4 ১৯
5 ২০ পূর্ণিমা	6 ২১	7 ২২	8 ২৩ নেতাজী জন্মদিবস	9 ২৪	10 ২৫	11 ২৬
12 ২৭	13 ২৮	14 ২৯	15 ৩০			

১৪২১ মাঘ

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
				Jan 16 ১ একাদশী	17 ২	18 ৩
19 ৪	20 ৫ অমাবস্যা	21 ৬	22 ৭	23 ৮	24 ৯	25 ১০ সরস্বতীপূজা
26 ১১ সাধারণতন্ত্র দিবস	27 ১২	28 ১৩	29 ১৪	30 ১৫ একাদশী	31 ১৬	Feb 1 ১৭
2 ১৮	3 ১৯ পূর্ণিমা	4 ২০	5 ২১	6 ২২	7 ২৩	8 ২৪
9 ২৫	10 ২৬	11 ২৭	12 ২৮	13 ২৯		

১৪২১ ফাল্গুন

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
					14 Feb ১	15 ২ একাদশী
16 ৩	17 ৪ শিবরাত্রি ব্রত	18 ৫ অমাবস্যা	19 ৬	20 ৭	21 ৮	22 ৯
23 ১০	24 ১১	25 ১২	26 ১৩	27 ১৪	28 ১৫	1 Mar ১৬ একাদশী
2 ১৭	3 ১৮	4 ১৯	5 ২০ পূর্ণিমা দোলযাত্রা	6 ২১	7 ২২	8 ২৩
9 ২৪	10 ২৫	11 ২৬	12 ২৭	13 ২৮	14 ২৯	15 ৩০

১৪২০ চৈত্র

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার
14 ৩০ চড়কপূজা						16 ১ পূর্ণিমা দোলযাত্রা
17 ২	18 ৩	19 ৪	20 ৫	21 ৬	22 ৭	23 ৮
24 ৯	25 ১০	26 ১১	27 ১২ একাদশী	28 ১৩	29 ১৪	30 ১৫ অমাবস্যা
31 ১৬	1 Apr ১৭	2 ১৮	3 ১৯	4 ২০	5 ২১	6 ২২
7 ২৩	8 ২৪	9 ২৫	10 ২৬	11 ২৭ একাদশী	12 ২৮	13 ২৯

নতুন জীবন

- সৌভিক ভট্টাচার্য

বাস থেকে নামতেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হেসে হাত বাড়ালেন, "মিস্টার চ্যাটার্জী?" আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম। বুঝলাম ইনিই হলেন বেরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নির্মলকান্তি মজুমদার।

একটু আগে থেকেই শুরু করি। আমি বীরভূমের এক নিতান্ত অচেনা গ্রামের ছেলে প্রদীপ চ্যাটার্জী। কলেজ থেকে B.Sc পাশ করে S.S.C দিয়ে ঘরেই বসেছিলাম। S.S.C-র রেজাল্ট কবে বেরোবে তার ঠিক নেই, এদিকে বাড়ির আর্থিক অবস্থা বাবা চাকরির থেকে রিটায়ার করার পর ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠল। এমন সময় হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন আমাদের বাড়িতে হাজির হলেন বাবার পুরনো দিনের বন্ধু সমীরণ বিশ্বাস। বাড়িতে আমার চাকরিহীন অবস্থায় হাত গুটিয়ে বসে থাকার কথা শুনে উনিই স্কুলের খবরটা দিলেন। বাবাকে বললেন যে "S.S.C-র রেজাল্ট-আউটের মাথামুন্ডু তো বোঝা যাচ্ছে না, এদিকে আমার ভগ্নিপতি যে স্কুলের আসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার সেখানে সায়েন্সের তিনজন টিচার পরপর রিটায়ার করায় স্কুলে সায়েন্সের টিচারের বড় অভাব। প্রদীপ তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তোর যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি নির্মলকে বলে তোর ছেলের জন্য মোটামুটি এক বছরের স্কুল মাস্টারের চাকরি যোগার করে দিতে পারব।" অতি উত্তম প্রস্তাব,অন্তত ঘরে বেকার বসে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। তাছাড়া S.S.C পরীক্ষাও আমার খারাপ হয়নি,ওতে লেগে গেলে তো আরো ভালো হবে। ঠিক হল যে সমীরণ কাকুই নির্মলবাবুকে বলে স্কুলেরই একটা রুম থাকার জন্য ঠিক করে দেবেন।

পরের সপ্তাহের সোমবার একদম সাত সকালে বাক্স-প্যাটরা গুটিয়ে চলে এলাম বেরগ্রাম। বাসে যেতে প্রায় আড়াই ঘন্টার মত লাগল। গ্রামটা মন্দ নয়। চারপাশে সবুজ গাছপালার মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে বাস এসে থামল বেরগ্রাম বাস স্টপে। নির্মলবাবু নিজের পরিচয় দিয়ে করমর্দন করলেন।

বাস স্টপ থেকে স্কুলটা বেশি দূরে নয়। মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। স্কুলটাতে ঢুকেই আমার নিজের স্কুল জীবনের কথা মনে পরে গেল। ওই দিনগুলোতে বন্ধুদের সাথে কত মজাই না করেছি। যাই হোক, প্রথমেই নির্মলবাবু আমাকে আমার ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। বললেন ওটা নাকি আগে স্কুলের লাইব্রেরি রুম ছিল। পরে অন্য জায়গায় লাইব্রেরি হওয়ায় রুমটা ফাঁকাই পরে ছিল। লাগেজ নামিয়ে হাত মুখ ধুয়ে

নিলাম। নির্মল বাবু বলেছিলেন আজকের দিনটা রেস্ট নিয়ে কাল থেকে শুরু করতে, কিন্তু আমিই না বললাম। ফালতু ফালতু হাত গুটিয়ে বসে থেকে করবই না কি! তিনি "বেশ তো" বলে অফিস ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। আমি একটু পরেই ওনার সাথে দেখা করছি বললাম। বাড়ি থেকে লুচি ঘুগনি মিষ্টি এনেছিলাম। ওগুলোর সদ্গতি করে অফিস ঘরের দিকে রওনা হলাম। অন্যান্য স্টাফ এবং হেডমাস্টার মশায়ের সাথে আগে ভালো করে পরিচয় করে নেওয়াটা খুব জরুরি। নির্মলবাবু ওদিক থেকে আসছিলেন, সঙ্গে একজন প্রশস্ত টাক এবং চোখে চশমা লাগানো ভদ্রলোক। বোধহয় ইনিই হলেন হেডস্যার। আমি হেসে নমস্কার করলাম। উনিও প্রতি নমস্কার করলেন। জানলাম ওনার নাম আশুতোষ চ্যাটার্জী। ভদ্রলোক বেশ আলাপী, নিজেই আমাকে স্টাফ রুমে নিয়ে গিয়ে সবার সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন। সর্বসাকুল্যে মোট কুড়িজন স্টাফ। আমাকে নিয়ে একুশ। আর স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছ'শোর কাছাকাছি। প্রায় সকলেই কাছাকাছি থাকেন। কেবল একজন দুর্গাপুর থেকে আসেন। আরো জানতে পারলাম, স্কুল শুরু হয় পৌনে এগারোটা থেকে, সাত পিরিয়ড হয়ে শেষ হয়ে প্রায় চারটেয়। আশুতোষ বাবু আমাকে রুটিন দেখিয়ে দিলেন। প্রতিদিন চার পিরিয়ড করে নিতে হবে। এইট নাইন আর টেনের অঙ্ক আর সিক্সের বিজ্ঞান ক্লাস। এপ্রিল মাস, সেশান সবে শুরু হয়েছে, দুদিন হল স্কুল খুলেছে। তিন পিরিয়ডের ঘন্টা পড়ল টংটং করে। টেনের অঙ্ক বইটা আর চক,ডাস্টার নিয়ে ক্লাসের দিকে রওনা হলাম। স্যারই দেখিয়ে দিয়েছিলেন ছাব্বিশ নম্বর রুমটা। কিছু ছেলে ক্লাসের বাইরে জটলা করেছিল, আমাকে দেখেই ক্লাসে ঢুকে গেল। আমিও ক্লাসে ঢুকলাম। ক্লাসরুমের সাইজ মাঝারি, সব মিলে মোটামুটি পয়তাল্লিশ জন ছেলে। বোধহয়ে আমাকে প্রথম দেখে ভাবল, নতুন স্যার নাকি রে বাবা! বি-এড টা করা ছিল, ভাবলাম আশা করি, ক্লাস টেনের ছেলেদের হ্যান্ডেল করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। তখনও পিছনের বেঞ্চের তিনটি ছেলে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আমি "হুম" করে একটু গলা ঝারলাম। ওরা সংকোচিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম "দেখ, আমি এই স্কুলে নতুন। তোমাদের স্কুলে ম্যাথসের টিচার না থাকার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি একবছরের মতো এই স্কুলে থাকব..." এই সময়ে পিছনের দিক থেকে কেউ যেন ফিক করে হেসে ফেলল, তাকিয়ে দেখলাম সেই গল্প করা ছেলেগুলোর মধ্যে একজন, বাকিরা মুখ চেপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করছে। মাথাটা গরম হয়ে গেল। প্রথমেই আমি অল্পতেই রেগে যাই। তাছাড়া প্রথম দিন ক্লাসে এসেই কারো গায়ে হাত তুলতে চাইছিনা। কিন্তু ছেলেগুলো টেনে পড়লেও, ভয়তো দূরে থাক শ্রদ্ধাও নেই টিচারের প্রতি! বললাম "তোমরা হাসছ কেন?" কোনো উত্তর নেই। যাই হোক আমি বললাম "দেখ আমার ক্লাসে গোলমাল করা কিন্তু আমি পছন্দ করব না। যাদের ক্লাস করতে ইচ্ছে হবেনা তারা যেন আগে থেকেই ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়। প্রথম দিন ক্লাসে এসেছি, আজকে আর পড়া শুরু করছিনা, আগে তোমাদের নামগুলো জেনে নিই.."

প্রথম দিনটা কেটে গেল। সারা বিকেল শুধু শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়না। স্কুল থেকে একটু বাইরে বেরোলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা চায়ের দোকান। চায়ের জন্য মনটা নেচে উঠল। গিয়ে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। দোকানের ভদ্রলোক বেশ আলাপী। বললেন "একাই তো থাকবেন সারা বিকেলটা, আসবেন একটু এদিকে গল্প গুজব করা যাবে।"

দুই

পরের দিন প্রথম পিরিয়ডটা ক্লাস টেনের। অ্যাটেনডেন্স খাতা নিয়ে ক্লাসের দিকে রওনা হলাম। টেবিলের উপর খাতা খুলে বসেছি এমন সময় "স্যার আসছি...", দেখলাম আগের দিনের পেছন বেঞ্চের সেই ছেলেগুলোর মধ্যে দুজন। দুজনের মধ্যে প্রথম জনের দিকেই বেশি নজর যায়। কলার তোলা সাদা জামার, হাতের আস্তিন গোটানো, মাথার চুল এলোমেলো, ক্লাস টেনের ছেলেদের চেয়ে বয়স একটু বেশিই হবে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ ছেলে বখাটে হয়ে গেছে। প্রতি ক্লাসেই এইরকম একদুটি ছেলে থেকেই যায়। আর কথা বাড়ালাম না, বললাম "এসো"...

নাম ডাকা শেষ হলে খাতা বন্ধ করতে যাব এমন সময় দেখি সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে পিছনের বেঞ্চে। জিজ্ঞাসা করলাম "কি হল?"-মাথা চুলকে বলল "স্যার প্রেজেন্ট দিতে ভুলে গেছি",যেন ভুলে যাওয়াটা কিছুই নয়। দেখলাম হাতে আবার বালা পড়া হয়েছে!! বললাম "যখন নাম ডাকা হচ্ছিল তখন মনটা কোন দিকে ছিল?" ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলাম "কি নাম? কত রোল?" “স্যার, সুবল হেমব্রম, তিপান্ন রোল।" --"আর কোনদিন এরকম যেন না হয়, নইলে স্কুলে এলেও প্রেজেন্ট হবে না" বলে অঙ্ক বইটা হাতে নিলাম। প্রথম প্রশ্নমালাটা মিশ্রণের। পাঁচের অঙ্কটা করার জন্য উঠেছি এমন সময় পিছনের বেঞ্চ থেকে ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজ পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম সুবলের পাশের ছেলেটা চোখ বড় বড় করে রেগে কিসব যেন বলছে, আমি যে অঙ্ক করাচ্ছি তার দিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। খুব রেগে গেলাম, মনে হচ্ছিল কান ধরে দুটোকে ক্লাস থেকে বের করে দিই। চক ডাস্টারটা টেবিলে রেখে উঠে গেলাম "কি হচ্ছে কি? আমি অঙ্ক করাচ্ছি বোর্ডে আর তোরা কনটিনিউয়াসলি বকে যাচ্ছিস?" পাশের ছেলেটা বলল "স্যার, সুবল ক্লাসের মধ্যে চ্যুইংগাম খাচ্ছিল। আমি আপনাকে বলে দেব বলাতে ও বলছিল টিফিনে আমাকে মারবে।" সুবলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,"ও কি সত্যি বলছে সুবল?" সুবল মাথা নিচু করে থাকল। আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে ওর দুগালে দুটো ঠাটিয়ে থাপ্পর লাগলাম, কান ধরে বেঞ্চ থেকে বার করে নিয়ে আসে বললাম, "প্রথমত দেরী করে ক্লাসে এসেছিস, তারপর প্রেজেন্ট দিতে ভুলে গেছিস, তারপরও আবার ক্লাস চলাকালীন চ্যুইংগাম খাচ্ছিস! স্কুলের ডিসিপ্লিন মানার কি কোনো প্রয়োজন নেই?" তারপর ওর ব্যাগের দিকে নজর পড়ল, দেখলাম কেবল একটা খাতা। "তোর বই কই রে? এতক্ষণ তো লক্ষ করিনি! কি অঙ্ক

করাচ্ছিলাম বলতে পারবি? তোর বাবার নাম্বার দে, তোর বাবার জানা দরকার ছেলে স্কুলে কি করে বেড়াচ্ছে।" সামনের বেঞ্চ থেকে কে যেন একজন বলে উঠল "বাবা থাকলে তবে তো..." মনটা একটু নরম হল,"কেন ওর বাবার কি হয়েছে?" সুবলই উত্তর দিল "বাবা আর মা বাস এক্সিডেন্টে মারা গেছে.." ওর চোখটা ছলছল করছিল, "তাহলে তুই থাকিস কোথায়?" "এখানে আমার মামার বাড়িতে" মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওকে একটু বেশিই বকে ফেলেছি। আর ক্লাস হলনা, ঘন্টা পরে গেল। সুবল কে বললাম, "তুই টিফিনে আমার সাথে দেখা করবি"।

চার পিরিয়ডের ঘন্টা পরার পর সুবল এসে স্টাফ রুমের দরজার কাছে দাঁড়াল। খবরের কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। ওকে দেখে উঠে গিয়ে "আমার সাথে আয়" বলে ঘরটাতে নিয়ে এলাম "বস চেয়ারটায়" বলে ওকে একটা চেয়ার দিয়ে আমি নিজে একটা চেয়ারে বসলাম। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ভয় পেয়েছে। ভাবছিল আমি হয়ত মারব। মুখোমুখি বসে জিজ্ঞাসা করলাম "কদিন ধরে এই স্কুলে পড়ছিস?"

-"নাইন থেকে স্যার"

-"আগে কোথায় থাকতিস?"

-"সুন্দিপুরে, বেরগ্রামের পাশের গ্রাম"

-"বাবা-মায়ের এক্সিডেন্ট কি করে হল?"

-"বাড়ি থেকে মামার বাড়ি আসছিল। রাস্তায় বাস উল্টে গিয়েছিল"

-"মামার বাড়ি এখান থেকে কতদূর?"

-"বেশি দূর নয় স্যার। দশ মিনিট লাগে হাটতে"

-"মামা কি করেন?"

-"একটা লটকনের দোকান আছে" তারপর ফুঁপিয়ে উঠে বলল, "ওরা কেউ ভালো নয় স্যার। কেউ আমাকে ভালবাসে না স্যার। মামি শুধু আমাকে কাজ করতে বলে। ইস্কুলে আসতে দিতে চায় না। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বাবা মা মারা যায়। তারপর স্যার ওরা আমাদের সব জমিগুলো নিয়ে নিল। গাঁয়ের লোকের কথা জোর করে ওদের বাড়িতে আমাকে থাকতে দিচ্ছে। টেনের কোনও বইও কিনে দেয়নি স্যার। মামাকে বললে মামাও দেয়না। মামি শুধু মামাকে বলে 'পরের ছেলে পুষে কি লাভ! তাড়িয়ে দাও ওকে। ভিক্ষা করে খাগ্গে' এখনও পর্যন্ত তাড়িয়ে দেয়নি ভাগ্য ভালো! বই তো নেইই আর

মাস্টারগুলোও কেউ বিনি পয়সায় পড়াতে চায়না, সব টাকার খেল স্যার"-এক নিশ্বাসে এতটা বলে সুবল থামল, চোখের জল মুছে নিচের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকল।

খুব খারাপ লাগছিল ওকে বকার কথা ভেবে। হঠাৎ একটা প্রবল জেদ চেপে বসল আমার ভিতর, ওকে বললাম "দেখ, কষ্ট সবারই থাকে। তা বলে কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকেনা। তোর কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় পড়াশোনা করা। পড়াশোনা করে সবাইকে দেখিয়ে দে দেখি, তুই অবহেলার পাত্র নোস! পারবি সুবল? পারবি? ছেড়ে দে এসব বাজে সঙ্গ।লেগে পরনা একটা বছর কষ্ট করে। তোকে পারতেই হবে। যা, জামা কাপড়, বই খাতা নিয়ে চলে আয় আমার কাছে। মামাকে বলে দে আজ থেকে তুই আমার কাছে থাকবি, খাবি-দাবি, পড়বি.. ওদের দয়ার পাত্র হয়ে না থেকে পারবি না ভালো রেজাল্ট করে সবাইকে দেখাতে? পারবি না?"...

দশ বছর পর

আনন্দবাজারটার উপর চোখ বোলাচ্ছিলাম। ক্রিং ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। সাত সকালে আবার কে ফোন করল রে বাবা!

-"হ্যালো..."

-"স্যার, সুবল বলছি স্যার.."

-"আরে সুবল! কেমন আছ বল?"

-"ভালো আছি স্যার, নববর্ষের প্রণাম নেবেন।"

-"আচ্ছা আচ্ছা, তুমিও আমার অনেক আশীর্বাদ নিও"

এক ঘন্টা ধরে কথা চলল। সুবল ফোন করলে এমনটাই হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সুবলের কথাই বলছি। পেরেছিল সুবল। সেদিনই বিকেলবেলা স্কুল ছুটি হবার পর সব কিছু নিয়ে চলে এসেছিল আমার কাছে। অসম্ভব কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল ওর মধ্যে। সেদিন থেকে ও হয়ে উঠেছিল অনেক নম্র,ভদ্র। পড়াশোনায় নেহাত খারাপ ছিল না ছেলেটা। ৭০% ও নিজে একটু ভাল করে পড়লেই পেত। তার সাথে আমি ওকে নিয়ে খেটেছিলামও প্রচুর। মাধ্যমিকে ও পেয়েছিল ৮২%। ওদের ব্যাচের টেস্ট পরীক্ষা হবার পরেই S.S.C-র রেজাল্ট বেরিয়েছিল। আমি পাশ করেছিলাম। দীর্ঘ এক বছর থাকার জন্য ওই স্কুলটার উপর মায়া জন্মে গিয়েছিল। সেদিন সুবলও খুব কেঁদেছিল। একটা বছর একই ঘরে ছিলাম, এক বেড শেয়ার করেছিলাম, একসাথে খেয়েছিলাম। ও ঠিক আমার ভাইয়ের মতন হয়ে গিয়েছিল। বাস স্ট্যান্ডে এসে

কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল "আজকে আমি আবার একা হয়ে গেলাম স্যার।" আমি বলেছিলাম, "ধুর বোকা, আমরা সবাই তোর সাথে আছি। পরীক্ষাটা ভালো করে দিস। তারপর আমি তোর সাথে যোগাযোগ করব।" মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর পর ও নিজে থেকেই ফোন করেছিল আমাকে। সেদিন বোধহয়ে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ ছিল না। নির্মল বাবুকে বলে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ওই ঘরটাতেই। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর ওকে আমি আমার এক জানাশোনা বন্ধুর সাহায্যে বিশ্বভারতীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এখন ও স্কুলের টিচার, বাংলার। সেদিন থেকে আজও বিজয়া দশমীর দিন কিম্বা নববর্ষের প্রথম ফোনটা ওর কাছ থেকেই আসে।

অতিপ্রাকৃত
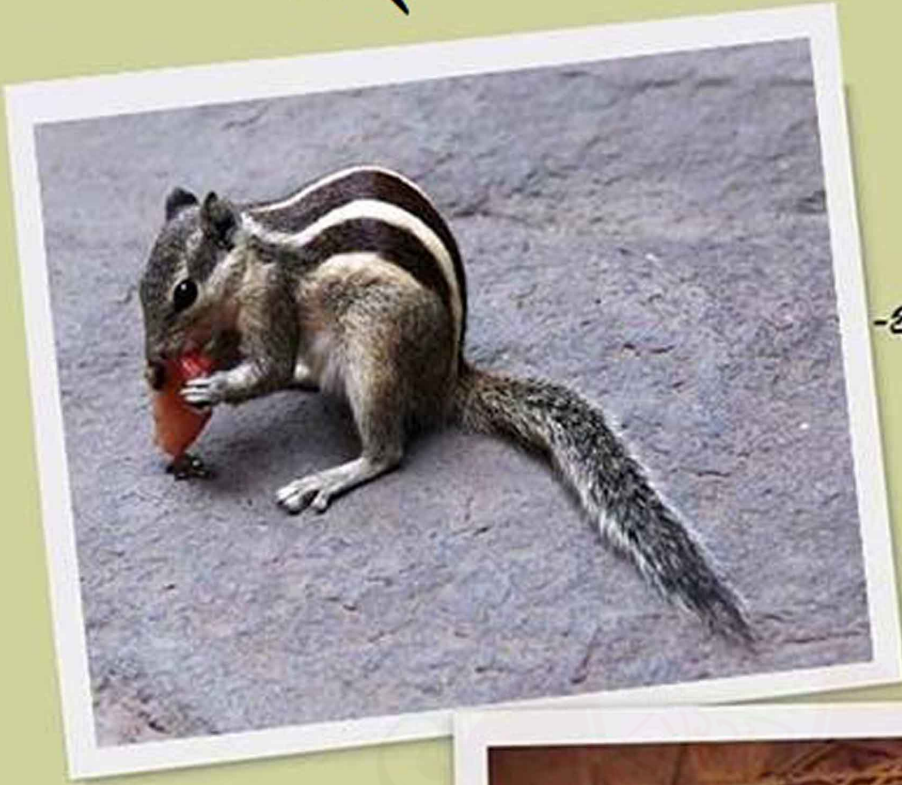
ভোজন রসিক
-প্রদীপ কুমার দাস

প্রথম আলো
-পূর্বা চ্যাটার্জী

প্রাকৃতিক
-সঞ্জয় দাস

কবিতা
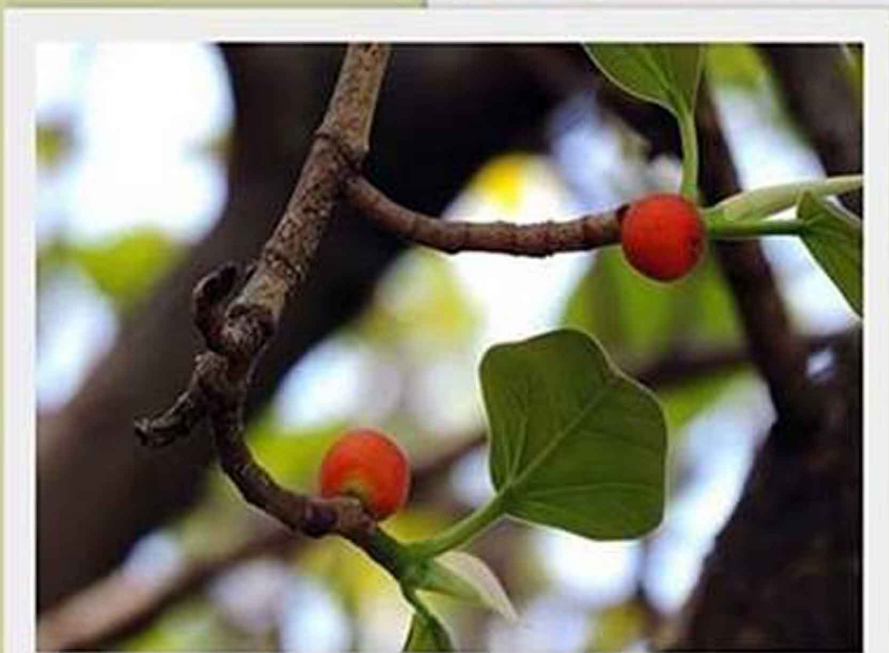
আমি থামব না

অর্ণব সেনগুপ্ত

মশাল জ্বালিয়ে একাই নেমে পড়েছিলাম রাস্তায়
ন্যায়, প্রতিবাদ, স্বার্থ ত্যাগের মশাল।
বুঝেছিলাম একাই ছুটতে হবে
পাশে এসে দাঁড়াবে না কেউ।
পারলে হাত তালি দেবে, নিভে গেলে দেবে গালি

তবুও ভেবেছি যতই আসুক বঞ্চনা আমি এগোবই
থামব না আমি থামব না...

হাজার বিপদ হাজার সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকে অতিক্রম করলাম
কিছু সঙ্গী পেলাম মাঝপথে
কিছু হারালাম

পথ হতে লাগলো সংকীর্ণ অমসৃণ
পড়লাম উঠলাম আবার পড়লাম
তবুও
থামলাম না আমি থামলাম না...

ন্যায়ের পথে এগিয়েছিলাম আমি
দিতে হল আহুতি
এসে দাঁড়াল মহা বিপদ

ওদের যে শক্তি বেশী...

শুধু মনের জোরে প্রতিবাদ টিকিয়ে রাখলাম
চারিদিক থেকে আসতে লাগল বাধা
শুরু হল দিশা হীন বর্বরতা
রক্তস্নাত ক্লান্ত আমি পড়লাম পথের ধূলায় লুটিয়ে...

পড়ে গেল মশাল নিভে গেল আগুন

ভুলসংশোধন

পুজোসংখ্যায় ভুলবশত এই নিচের ছবিটির প্রেরকের নাম দেওয়া হয়নি, তাই এই সংখ্যায় সেই ভুলসংশোধন করা হল৷

ছবি-শরদিন্দু চক্রবর্তী

কবিতা

নিয়তি

কোয়েল মজুমদার

হয়েছি দূর সবার থেকে,
হয়েছি আরো একলা,
মন খুঁজে বেড়ায় আড়াল
ভিড়ের মাঝারে,
বেতালা এক সুর তাড়িয়ে নিয়ে
বেড়ায় আমায়, দিন ভর,
দাঁড়াই এসে খাদের ধারে,
এক বুক নীল আকাশ...
ঢুকে পড়তে চায়, পাঁজরে ধাক্কা
দেয় বার বার
শিরা থেকে উপশিরায় ছড়ায়
সেই নীল
কেঁপে উঠি আমি, এই তবে
অনিবার্য ছিল?
এবার বুঝেছে মন, নিয়েছে
মেনে অমোঘ ইশারা,
আর ফেরা হবে না আমার
তোমার কাছে।

পাখিরালয়

একা একা

-শ্রাবনী দাশগুপ্ত

হলুদ পাখি

-শ্রাবনী দাশগুপ্ত

অভিমান

-পূর্বা চ্যাটার্জী

নতুন জামা

- সোমা মজুমদার

-মা আমায় একটা নতুন লাল জামা কিনে দেবে?

কাশতে কাশতে কথাটা মা কে বলল বাবুন।

-কেন রে কি হল তোর আজ হঠাৎ?

-জানো মা, আমাদের পাঠশালায় বিল্লু আজ, নতুন জামা পড়ে এসেছিল। কি সুন্দর জামাটা। আমিও এমন একটা জামা পড়ব।

-আচ্ছা বাবা কিনে দেব, আগে তুই পুরোপুরি ভাল হয়ে যা। কাল থেকে আর পাঠশালায় যেতে হবে না।

এই ভাবে শুরু হল মালতীর বিকেলটা, ছেলের সাথে। ছেলেটার জ্বর যে কিছুতেই সারছে না, বাড়ছে না, কিন্তু পুরো কমছেও না যে। তাই নিয়ে খুব দুর্ভাবনাও হচ্ছে মালতীর। গ্রামের বড়লোক শ্যামলবাবুর বাড়িতে কাজ করে মালতীর চলে যায়। শ্যামল রায় বড়লোক হলেও হৃদয়বান। কিন্তু সবসময় ওনার কাছে হাত পাততে মালতীর খারাপ লাগে। ওনার দয়াতেই গ্রামের ভাল একটা পাঠশালায় ছেলেকে পড়াতে পারছে।

-ওমা··· কি ভাবছ?

ছেলের ডাকে ভাবনাটা ভেঙ্গে যায় মালতীর। ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখে জ্বরটা যেন বেড়েছে। মনে ভয় বাসা বাঁধে। এই রকম দু'দিনের জ্বরে স্বামীকে হারিয়েছে মালতী। কি যে করে ও বুঝে ওঠে না। ভাবে একবার ডাক্তারের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে। কিন্তু ছেলেটাকে একা ফেলে রেখে যেতেও মন চায় না মালতীর।

-কিছু ভাবছি না রে, কি আবার ভাবব? তুই এবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

-ও মা, আমাকে একটা নতুন জামা কিনে দেবে গো, বিল্লুর মত।

-ওরে বাবা, ওরা তো অনেক বড়লোক, অমন জামা আমি কোথা থেকে পাব বাবা?

-বড়লোক! কিন্তু ও তো আমারই বয়সী মা। বড়লোক কি ভাবে হল? ও মা, বলনা বড়লোক কিভাবে হয়? আমিও বড় হয়ে বড়লোক হবো, দেখো।

-যার অনেক টাকা সেই বড়লোক, বাবা। বড়লোক হতে গেলে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে, তার জন্য অনেক অনেক পড়াশোনা করতে হবে। আগে সুস্থ হয়ে ওঠো সোনা।

ছেলেকে সকালের খাবারটা গরম করে দিয়ে, মালতী ঘরের বাইরে এল। হঠাৎ মনটা এত খারাপ হয়ে গেল কেন বুঝতে পারল না। কতক্ষণ এভাবে চৌকাঠে বসেছিল খেয়াল নেই। চোখে ঘুম আসতে উঠে ঘরে গেল মালতী। দেখল ঘরে খাবার মত কোনও খাবার নেই। মুড়ি জল খেয়ে শুয়ে পড়ল ও।

খুব ভোরে মালতী ঘুম থেকে উঠে দেখে ছেলে ঘুমোচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল গা আগের চেয়ে কম গরম। ছেলেকে ঘুম থেকে না তুলে মালতী কাজে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল। ছেলেটাকে ঘরে একা রেখে এলাম, ঘুম থেকে উঠে কি করবে কে জানে। মনে মনে এমন ভাবতে ভাবতে মালতী শ্যামলবাবুর বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল। আর মনে মনে ভাবল ফেরার সময় ডাক্তারবাবুকে সাথে করে বাড়ি নিয়ে আসবে। শ্যামল বাবুর বাড়ি থেকে কিছু টাকা পাবার কথা ছিল মালতীর। ওর তো মনেই নেই। তাই আজ হঠাৎ কিছু টাকা হাতে পেয়ে ও তো ভীষণ খুশী। ভাবল বাবুনের তো ওষুধ আছেই, তাহলে ওর জন্য একটা নতুন লাল জামা-ই আজ কিনে নিয়ে যাবে। ফেরার পথে ওর চেনা এক দোকানে গেল মালতী, যাতে টাকা কম পড়লে পরে দেওয়া যায়। একটা পছন্দ মত লাল জামা কিনে ডাক্তারের কাছে গেল ও।

-ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে টাকে একবার দেখে আসবেন?

-কেমন আছে সে?

-আসার সময় তো দেখে এলাম গা ঠাণ্ডা আছে। ঘুমচ্ছিল তো।

-ঠিক আছে তুমি যাও। আমি ডাক্তার খানা বন্ধ করে আসছি।

আজ মালতী খুব খুশী জামাটা কিনতে পেরে। কাল ছেলেটা এমন ভাবে বলল।

ঘরে ঢুকে দরজা খুলে ছেলেকে ডাকল মালতী।

-বাবুন, বাবুন উঠে পড়। ডাক্তারবাবুকে বলে এসেছি। এখনি এসে পড়বেন। কিরে ওঠ।

ছেলের গায়ে ধাক্কা দিল মালতী। গা বরফের মত ঠাণ্ডা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল ওর বুক। বার বার ডাকতে লাগল ছেলেকে। কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে প্রায় কাঁদতে লাগল। আবার ডাকতে লাগল।

-তোর জন্য নতুন জামা এনেছি। এই দেখ, উঠে পড় সোনা।

বাইরে ডাক্তারের গলা শোনা গেল।

-মালতী আছ নাকি?

ছুটে এল মালতী।

-ডাক্তার বাবু শিগগির আসুন। আমার ছেলে উঠছে না, কোন সাড়া দিচ্ছে না।

ডাক্তার বাবু ছুটে গেলেন ঘরের ভিতর। বাবুনের গায়ে হাত দিয়ে তিনি বুঝলেন ওর ছোট্ট শরীরে আর প্রাণ নেই।

-মালতী, আজ ভোরেই ও.........

ডাক্তারের গলার স্বর ধরে এল। আমি গিয়ে শ্যামলবাবুকে খবর দিচ্ছি।

লাল নতুন জামাটা ছেলের গায়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল মালতী। মনে হল কেউ যেন ওর হৃদয়টাকে শরীর থেকে আলাদা করে দিতে চাইছে। হঠাৎ মেঘের গর্জনের সাথে বৃষ্টি নামল গ্রামে। চোখের জলে বৃষ্টি স্নাত গ্রামটা বড়ই ঝাপসা লাগছিল ওর চোখে। এই ভাবে মালতীর মত কত মায়ের চোখের জল আমরণ ঝড়ে মিশে যায় সমাজের বুকে, আর সময়ের সাথে শুকিয়ে যায় কেউ তার খোঁজ রাখেনা। শুধু হৃদয়ে থেকে যায় ক্ষত আর চোখের নীচে অশ্রুর শুকনো দাগ যা কখনও মোছে না।

কবিতা

কথোপকথন

আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলুদা, ও ফেলুদা।
--কেন ডাকিস এত?
জানো না বুঝি? রবার্টসন-এর রুবি।
-- কেন ? তুই কি গোয়েন্দা হবি?
তারপর যে আর যায় না দেখা!
-- তোর কি বড় লাগছে একা?
জটায়ু কোথায়? কোথায় তিনি?
-- জানিনা ঠিক, কোথায় উনি?
সত্যি বড় ভয় করছে!
-- সাহসের অভাব ঘটছে!
তোপসে গেল কই?
-- আঃ! করিস নে হইচই!
তুমি কিছু বলনা কেন?
--ফেলু এবার ... বিরতি নিল!

ধাঁধার সমাধানঃ

১। -একটাই -- ভারত, বাকি সবই তো বিদেশ;

২। -কালী ঠাকুরের তো চারটে হাতই হয়, এক্ষেত্রে চার হাতওয়ালা

কালির মূর্তি ছোট ছিল।

৩। --প্রথমে ছেলে আর মেয়ে ওপারে যাবে। মেয়েকে ওপারে রেখে

ছেলে ফিরে আসবে। তারপর বাবা একা ওপারে যাবে, মেয়ে আসবে। এরপর

ছেলে ভুলকে রেখে আবার এপারে এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে। মেয়েকে

রেখে ছেলে চলে আসবে এপারে। মা ওপারে একা যাবে আর মেয়ে আসে।

ছেলে মেয়ে দুজনে একসাথে ওপারে যাবে।

৪। --কোথায় আবার! চাঁদেই।

৫। --হোটেল – নট ফিট।

" আজ পয়লা বৈশাখে,

ফেলুদা সকলকে ডাকে---

সকলে মিষ্টি দেয় মুখে,

(তারা) আনন্দেতে নাচে সুখে---

এরই মাঝে কোথা হতে,

চলে আসেন চট্টরাজ,

ফেলুদার এখন একটাই কাজ---!!!!!!

জয়বাবা ফেলুনাথ, সব ক্রিমিনাল

কুপোকাত! "

"~FELUDA FAN CLUB~"

বৈশাখ মানেই নবজাগরণ। বাঙালির নতুন বছর। নতুন জামা কাপড়ের সঙ্গে নতুন অ্যাপস্ আর নতুন সেলফি পোস্ট করা। আর তারই মাঝে আমাদের এই নতুন প্রচেষ্টা দিয়েই আপনাদের সবাইকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বছরটা আমাদের মত আপনাদেরও খুব ভাল কাটুক এই আশা নিয়েই শেষ করছি। ফেলুদাকে নিয়ে আমাদের ~FELUDA FAN CLUB~ এর এই নতুন যাত্রাপথে আপনারাও শামিল হোন। এই ম্যাগাজিন আপনাদের কেমন লাগল জানার জন্য আমরা মুখিয়ে রয়েছি। শুভেচ্ছা রইল।

Join us

https://www.facebook.com/amraofeluda.ffc

https://www.facebook.com/feludafanclub

feludafanclub.01@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/